প্রথম অধ্যায়ঃ

ক)আন্তর্জাতিক পটভূমি------এ পর্বের কবিতার

সাধারণ নমুনা

খ) প্রগতিশীল ঐতিহ্যঃ রবীন্দ্রনাথ

।।প্রথম অধ্যায়।।

ক) আন্তর্জাতিক পটভূমি

আমাদের দেশে তিরিশের দশকে যে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ছিল বিশ্ব-রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আসলে ভিন্নধর্মী প্রকাশ-মাধ্যম হয়েও সাহিত্য এবং রাজনীতি এই পর্বে এসে যৌথ ও সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। এর মূলে ছিল প্রবল মানবিক আবেগ ও বিবেকী প্রত্যয়। এই আবেগ দানা বেঁধেছিল অত্যাচারিত দেশ, জাতি ও মানুষের সপক্ষে আর এই প্রত্যয় উদ্দীপ্ত করেছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধাত্মক আন্দোলনে সামিল হতে। ফলে সাহিত্যের প্রথা-প্রচলিত শিল্পতত্ত্বের বনিয়াদ ভেঙে পড়েছিল আর অন্যদিকে রাজনীতিতেও এসেছিল এক নতুন দৃষ্টিকোণ, সংযোজিত হয়েছিল একটি নতুন মাত্রা।

এর বহুদিন আগেই কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে, বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে। বলেছিলেন, একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কী চিন্তা করে তা দিয়ে নয়, তার চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে হয় বৈষয়িক জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ থেকে।[1] অর্থাৎ শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারটাও কোন ভুঁইফোড় ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কে যুক্ত থাকে সেই কালপর্বের উৎপাদন-ব্যবস্থা। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণে রেখে লেনিনকে শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পসাহিত্যের বিশেষ গুরুত্বের কথা উত্থাপিত করতে হয়েছে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পার্টি অর্গানাইজেশন এ্যান্ড পার্টি লিটেরেচার' প্রবন্ধে, এর নীতিনির্ধারণের প্রশ্নে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্যঃ

'It is not simply that, for the socialist proletariat, literature can not be a means of enriching individuals or groups; it can not, in fact, be an individual, independent of the common cause of the proletariat...Literature must become part of the common cause of the proletariat, "a cog and a screw" of one single great Social-Democratic machanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class.'[2]

লেনিন সাহিত্যের ব্যাপারটাকে সংগঠিত, পরিকল্পিত ও সম্মিলিতভাবে পার্টি-কাজের অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কে উপস্থাপিত করেন। একই অভিমত ব্যক্ত হয় মাও সে-তুঙের ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ইয়েনান বক্তৃতায়:

> '...literature and art fit well into the whole revolutionary machine as a component part, that they operate as powerful weapons for uniting and educating the people and for attacking and destroying the enemy, and that they help the people fight the enemy with one heart and one mind.''[3]

শিল্পসাহিত্যের এধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ভূমিকা প্রচলিত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বাস্তবিকপক্ষে এই প্রতিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-পর্বে আন্তর্জাতিক সংকটের এক বিশেষ পটভূমিতে চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই সংকট-সময়েই গড়ে ওঠে দেশে-বিদেশে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন।

১৯১৭খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় সফল নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং একটা দেশে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার যে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল, তিরিশের দশকে সে চিন্তাধারা বিভিন্ন সংকটে ব্যবহারিক প্রয়োগের যথাযথতায় নানা দেশে লাভ করে এক বিশাল ব্যাপকতা। রাশিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি মানুষ ও কৃষকশ্রেণীর মনে এনে দিয়েছিল এক গভীর আত্মবিশ্বাস। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলনে স্বভাবতই একটা জোয়ার এসেছিল। অর্থনীতির পরিভাষায় আমরা যাকে বলি পুঁজি বা ক্যাপিটাল, সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদ দেখা দেয় তার। এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের একটি মৌলিক দুর্বলতা হল, তাদের প্রতিনিধিত্বকারীদের শ্রেণী-সমঝোতা ও শ্রেণী-সহযোগের নীতির অনুসরণ---এমন কি বিপ্লবী মতবাদ থেকে পিছিয়ে আসার ঘটনাও তাদের দুর্বলতার একটি দিক, এমনি এক আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে উদ্ভব হয় ফ্যাসিবাদের। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপর্বে ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনগণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবিশ্রেণী, মানবপ্রেমিক ধর্মীয়বৃন্দ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় লেখক-শিল্পী ও সাধারণ মানুষ। কেননা, ফ্যাসিবাদ এমন এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যা শ্রমিক-আন্দোলনেরই কেবল বিরোধী নয়, যেকোন দেশ-জাতি-মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সে বিরোধী। ফলে ইউরোপের নানা দেশে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত হয়, সংঘবদ্ধ ঐক্যপ্রয়াসেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন এইরকম

সংঘবদ্ধ প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। কাজেই, এই আন্দোলনের মূলে যে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে তার বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকৃতি: ১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ

ধনতন্ত্রের অসমান বিকাশের নিয়মে(the law of uneven development of capitalism) শিল্প-বিপ্লবোত্তর দুনিয়ায় দেখা গেছে তার অভ্যন্তরীণ নানান সংকট, বিভিন্ন বিক্ষোভ, অসংগঠিত জনতা ও মেহনতি মানুষের বেঁচে থাকার দুর্বার তাগিদ। ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সব দেশেই শ্রমিক ও মজুরশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রয়াসই ছিল এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় শ্রমিক ও মজুরের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা যার প্রাথমিক প্রয়াস 'কমিউনিস্ট লীগ' গঠন এবং ১৮৬৪খ্রীষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র সৃষ্টিপ্রয়াস। ধনতন্ত্রের বিস্তার-সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবী দুটি বিবদমান শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। মার্কসের মতে, আধুনিক বুর্জোয়া-যুগের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যই হল সরলীকৃত এই দুটি শ্রেণীবিরোধ---বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েত।[৪] উৎপাদন-ব্যবস্থায় অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকলে বুর্জোয়া উৎপাদকেরা নিত্য নতুন বাজারের সন্ধানে, এভাবেই নিজেদের উৎপাদিত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমস্ত পৃথিবীময় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।[৫] এভাবেই এই শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে নিজ আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন চাপ আসতে বাধ্য।

১৯১৪খ্রীষ্টাব্দের ২৮জুন সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রান্জ ফার্ডিনান্দের সস্ত্রীক নিহত হওয়ার ঘটনাটা তুচ্ছ, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া মোড় নেয় মহাযুদ্ধের দিকে। ডেভিড টমসন এই মহাযুদ্ধের নিহিত প্রকৃতির সন্ধান করতে গিয়ে বলেন, 'It was the first general conflict between the highly organized nation-states of the twentieth century, able to command the energies of all their citizens or subjects, to mobilize the productive capacity of heavy industries and to utilize all the resources of modern technology to find new methods of destruction.'[৬]

সম্পূর্ণ ঘটনাটা জড়িয়ে আছে ধনতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে। লেনিন এই যুদ্ধকে সরাসরি চিহ্নিত করেন 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'[৭] বলে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শ্রমিক কিংবা মজুরের কোন স্বার্থ নেই---বরং এই

যুদ্ধকে নিজের দেশের শাসক-সরকারের বিরুদ্ধে লাগিয়ে তাদের পরাজয় ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করাই হবে প্রলেতারিয়েতশ্রেণীর কাজ। এতে বিপ্লবের পথই প্রশস্ত হবে---এমন অভিমত ব্যক্ত করেন লেনিন। সাম্রাজ্যবাদীযুগে অন্তর্বিরোধের অনিবার্য পরিণাম হিসেবে এই যুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সামনে বিপ্লবী-উত্থানের পথ খুলে দেয়। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি একটু অন্যভাবে,---সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক বৃহৎ দেশসমূহের পারস্পরিক সংঘাত প্রধান কূটনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে প্রচলিত 'ব্যালান্স অব পাওয়ার', অর্থাৎ শক্তির ভারসাম্যের নীতি অনুযায়ী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জারতন্ত্রী রাশিয়া, আর অন্যদিকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে জার্মানি, বুলগেরিয়া, তুর্কি প্রভৃতি দেশ। পরে প্রথমপক্ষে যোগদান করে আমেরিকা, ইটালি ও জাপান।

যুদ্ধ থেমে গেলেও এর জের রয়ে যায় পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশের অভ্যন্তরে আগামীর ভয়াবহ সংকেত হিসেবে। জার্মানির পরাজয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি। কিন্তু তার অর্থ শান্তি নয়---১৯১৯খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'শান্তি সম্মেলন' এই কারণে ব্যর্থ। শান্তি যে এক ও অবিভাজ্য ('Peace is one and indivisible'), এই কথা ভুলে গিয়ে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮জুন ভার্সাই-সন্ধি প্রস্তাবে গৃহীত হয় এক সাম্রাজ্যবাদী ও স্বেচ্ছাচারী নীতি যার অন্যতম শর্ত জার্মানিকে নগদ অর্থে ও পণ্যদ্রব্যের দ্বারা যুদ্ধের জন্যে মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা, জার্মানির হাত থেকে সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া, তাকে নিরস্ত্র করা।[৮] ভূসম্পত্তি, জনসংখ্যা আর কাঁচামালের দিক থেকে জার্মানির এ অবস্থায় দুর্বলতর হওয়াই স্বাভাবিক। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ভার্সাই-প্রস্তাবে শক্তির ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার মত যেমন উপকরণের অভাব ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না শান্তি বিনষ্ট ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার মত উপকরণের। ডেভিড টমসনের আর একটি মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

'In 1921 the reparations payments demanded from Germany had been fixed at £6,600,000,000. The Dawes Plan of 1924, which arranged for payments of this sum to be made in annual instalments, also arranged for Germany to receive a foreign loan of £40,000,000. This loan was over-subscribed, more than half the total coming from the United States and more than a quarter from Great Britain... Few saw the dangers in the paradox of lending Germany money to pay back in reparations.'[৯]

এমনতর ব্যবসায়-বৃদ্ধিতে বিস্ময়ের অবকাশ খুব কম। একদিকে জার্মানির ওপর এই চাপ, আর অন্যদিকে 'প্লান প্রোডাকসনে'র ফলে মাত্র আড়াই বৎসরে আমেরিকা যুদ্ধারম্ভের তিনশ কোটি ডলার ঋণ শোধই করে নি, যুদ্ধশেষে পৃথিবীর কাছে তার বকেয়া পাওনা দাঁড়ায় হাজার কোটি ডলারে। তাছাড়া আমেরিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে দেয়। অধিক উৎপাদনের ফলে অতঃপর দেখা দেয় সংকট। যন্ত্রশিল্প ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অনেকখানি এগিয়ে থাকলেও যুদ্ধের ফল অর্থনৈতিক ক্ষয় রোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৯২৯-৩১খ্রীষ্টাব্দ সেই অর্থনৈতিক সংকটের কাল। ব্রিটেন স্বর্ণমান ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দে ত্যাগ করে। অধিক শুল্কের জন্যে ফ্রি-ট্রেড বা অবাধ-বাণিজ্য বিনষ্ট হয়, দেখা দেয় সর্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন। নিউইয়র্কে ফাটকাবাজির ধুম পড়ে যায়---শেয়ার বাজারের এই পতন সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক বন্যা। এই বিশেষ দিনটি ছিল ২৯অক্টোবর, ১৯২৯খ্রীষ্টাব্দ। সারা বিশ্বে এর ফলাফল ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সমালোচক প্রদত্ত একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে এই বন্যা অবস্থার ভয়াবহ চিত্র: 'This was the worst year for industrial output in all the major manufacturing countries.By 1932 unemployment in Germany totalled 6 million,in Britain 3 million,in the United States 13 million.'[১০]

এই বন্যার অবস্থায় জার্মানির নিকট যুদ্ধবাবদ প্রাপ্য ৬৫০কোটি ডলারের চাপ থাকে, ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দে জেনেভায় অন্তর্দেশীয়করণের জন্যে বৈঠক বসে, সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়। সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ চলাকালীন তৃতীয় আর একটি নতুন অবস্থা দেখা দেয়---১৯১৭খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সামনে যা আশঙ্কার হেতু। 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' তৃতীয় কংগ্রেসে লেনিন শ্রমজীবী শ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।[১১]

বস্তুত এই প্রেক্ষাপটে জেগে ওঠে উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের সাধারণ জনতা ও মেহনতি শ্রমিক-মজুর। যুদ্ধের ফলে এরা হতাশ হয়ে পড়ে নি, লেনিন বলেন, বরং বিশ শতকের গোড়া থেকে রাশিয়া, তুরস্ক, পারস্য, চীন বিপ্লবের ফলে তারা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের দিকে সচেতন দৃষ্টিক্ষেপ করে।[১২] যেহেতু জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ, সেইহেতু ভারত ও স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্ব-রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসক ফ্রান্স থেকে চীন পর্যন্ত প্রসারিত সমরাঙ্গনে প্রায় দশ

লক্ষেরও অধিক ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করে যাদের প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত একজন নিহত অথবা আহত হন এবং এই যুদ্ধে মোট ব্যয় বার কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি হয় যার ফল ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ তিরিশ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া। এই ভার বহন করতে হয় ভারতীয়দের।[১৩] যুদ্ধ ও যুদ্ধের অভিঘাত সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ-এ ব্রিটিশপ্রচারকদের বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রচারের জন্যে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। 'নিরাপদ মুক্তির যুদ্ধ', 'মুক্তি ছাড়া তাদের যুদ্ধের আর কোন লক্ষ্য নেই' অথবা আমেরিকান প্রেসিডেন্টের চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের মধ্য দিয়েও তথাকথিত মহান আদর্শকে এতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়।[১৪] সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্বিরোধের ফল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছে এ-সত্য ভারতবর্ষের মত অন্য অনেক দেশেই স্পষ্ট হয় নি।

এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা সারা বিশ্ব জুড়ে দেখতে পাই, বিশেষত ঔপনিবেশিক দেশসমূহে গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মত বিপ্লবী শক্তির উদ্ভব আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টায় উপনিবেশগুলিতে বর্বর অত্যাচারের মাত্রাবৃদ্ধি-- এই দুটি ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তৃতীয় একটি অবস্থানও গড়ে ওঠে। এই সময় যুদ্ধবিরোধী ভাবনা থেকে, মানুষের অপঘাত মৃত্যুকে রোধ করার মানবিক ও শুভ প্রয়াস থেকে, চিন্তার জগৎকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করতে স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, লেখক, চিন্তাবিদ্ ও মানবিক মূল্যের প্রতি আস্থাশীল কিছু মানুষ যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯খ্রীষ্টাব্দের ১৬মার্চ রচিত ও ২৬জুন 'ল্যুমানিতে' প্রকাশিত 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী' ('Declaration of Independence of thought') -তে নবজন্মের সাম্যপ্রয়াসী রোমাঁ রোলাঁ বলেন, 'হে মানসক্ষেত্রের শ্রমিকগণ, পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হে সমধর্মী সহকর্মীগণ, যুদ্ধরত জাতিগুলির বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদনীতির ফলে গত পাঁচ বৎসর সেনাবাহিনীর দ্বারা তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ। আজ যখন সীমান্ত প্রাচীর আবার খুলিয়া পড়িয়াছে তখন পুনরায় ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের জন্য এই আবেদন তোমাদের কাছে পাঠাইতেছি। ...যুদ্ধ আমাদের বিশৃঙ্খলার গর্তে নিক্ষেপ করিয়াছে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তাহাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও মনকে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ করিয়াছে। ......যে ক্ষমতালুব্ধ শক্তিনিচয়ের পায়ে স্বেচ্ছায় সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়া আমরা উহাদের ক্রীতদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা যে আমাদের জীবনে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটাইয়াছে তাহা সর্বপ্রথমে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। ...... দম্ভ ও হানাহানি ইহাদের মধ্যে কোনোটাই আমরা গ্রহণ করিব না। দুটিকে বর্জন করিয়া চলিব। একমাত্র সত্যকেই আমরা মানিব। মানিব সেই সত্যকে যে-সত্যের গায়ে কোনো সীমানা নাই, যে সত্যের পূর্ণতাকে

ভৌগোলিক সীমান্ত-প্রাচীর দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে না, যে সত্যের বিস্তৃতির শেষ নাই, জাতি ও বর্ণের সংকীর্ণতা যে-সত্যকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না।"[১৫] এই ঘোষণাবাণীতে স্বাক্ষর করেন পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে আনন্দকুমার স্বামী।

কাজেই, এ কথা বলা চলে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়াজাত পরিণতিই এক অনিবার্য নিয়মে প্রগতিবাদী মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আত্মিক প্রেরণা যুগিয়েছে। অবশ্য, একই সঙ্গে বলা চলে যে, যুদ্ধ-পরবর্তী সংকট ও সমস্যা যা কি না বস্তুতই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যুগ্ম ক্রিয়া মাত্র, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও আবাহন করে আনে, সেই পটভূমিতেই খ্যাতিমান ও অখ্যাতজনেরা ঐক্যপ্রয়াসী হয়ে ওঠেন এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থানে থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করতে এই প্রথম সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও পটভূমি:

দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি সূচনা করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এদিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতিও তদনুরূপ। কিন্তু পরিস্থিতি উভয়তই আলাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বরে,[১৬] কিন্তু তার আনুপূর্বিক পরিস্থিতিগত উপাদান প্রথম মহাযুদ্ধের মৌল প্রকৃতি ও চরিত্র থেকে একেবারে ভিন্নতর। স্বভাবতই এই স্বাতন্ত্র্য এসেছে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসাধনের (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্তী অবস্থার অভ্যুদয়ে। পৃথিবীতে তখন ধনতন্ত্র একক শক্তিতে বিদ্যমান নয়। সমাজতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রটি ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াচ্ছে---এই নতুন যুগের মৌল বিরোধ মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের আর গতিশীল সমাজতন্ত্রে। সমালোচকের মতে, সাম্রাজ্যবাদের ভেতরকার অন্তর্বিরোধই তখন আর এই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, অবশ্য বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে বটে, তবে তার প্রকাশ ঘটছে যুগের মৌল বিরোধের ঘাত-প্রতিঘাতের পটভূমিতে।[১৭]

দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীযুগে সবচেয়ে বড় করে যে-প্রশ্নটা দেখা দিয়েছিল, তা হল উদ্ভূত এক নতুন শ্রেণীর শ্রেণীহীন সমাজের আশা-ভরসা, গণতন্ত্রের ফলে মানুষের যতটুকু লাভ হয়েছে তাকে রক্ষা করবার উপায়, স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আর অন্যদিকে সকল প্রতিক্রিয়ার বাহন হিসেবে সমরতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট-প্রভুত্ব[১৮]---এর যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এই প্রশ্নে সমগ্র বিশ্ব তখন দ্বিধাবিভক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং পঙ্গু ধনতন্ত্রবাদ ইউরোপে এই সুযোগে ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের

প্রতিষ্ঠা ঘটায়। ১৯২২খ্রীষ্টাব্দে ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনি(১৮৮৩-১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দ), ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে এডলফ হিটলার(১৮৮৯-১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দ), ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে প্রাক্তন সেনানায়ক ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতার শীর্ষে আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করে তোলে। পরে এশিয়াতেও, বিশেষ করে জাপানের তোজোর চীন আক্রমণের মধ্যে দিয়ে আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। লক্ষ করবার, এগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে ইটালির মুসোলিনি এবং জার্মানির হিটলারই নিজেদের মতবাদগত সংগ্রামকে রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কাজে লাগান। ইটালিতে ক্ষমতাসীন হয়ে মুসোলিনি তাঁর বিশিষ্ট মতবাদ 'ফ্যাসিবাদ'কে প্রচারের উদ্দেশে বহু ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, কর্মসংস্থান ও ঐতিহ্য পুনরুজ্জী-বনের মত কল্যাণমূলক বহুবিধ কাজ তাঁর বিশেষ মতবাদকে ইটালির জাতির গভীর পৌঁছোবার সুযোগ করে দেয়। মুসোলিনি তাঁর দেশের জনগণকে অন্তত এ কথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন সমস্যার মীমাংসা হতে পারে না, জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্টিলাভ করতে পারে না, সর্বোপরি জাতীয় রাষ্ট্রেরও কোনপ্রকার উন্নতি অসম্ভব। কাজেই, তাঁর মূল লক্ষ্য হল ইঙ্গো-মার্কিন প্রভুত্বের অবসান ও দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের বিরোধিতার দ্বারা তাঁর ফ্যাসিবাদকে ইটালিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

মুসোলিনির ফ্যাসিবাদকে বোঝার আগে শব্দটির উৎপত্তিসংক্রান্ত কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে:

'The term Fascism itself comes from the word fasciare, which means to bind. Fascism was hoped to bind the Italian nation into an organic entity, which would continue to develop the traditions and glories of ancient Rome. In fact, its symbol, the 'fasces', was the two-headed ancient Roman axe noting authority.'[১১]

মুসোলিনি এই রোমক-ঐতিহ্যের প্রতীকটিকে একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রমূলে সংস্থাপন করেন। অন্যান্য মতবাদের মত তাঁর ক্ষেত্রেও তত্ত্ব ও প্রয়োগের একটা ব্যাপার আছে। তাঁর তত্ত্বে, রাষ্ট্রের মূলে ব্যক্তিসত্তার অবলোপ, অধ্যাত্মবাদী দর্শন, সর্বত্র ক্ষমতার মাত্রা ইত্যাদির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত হল:

'Fascism, in short, is not only the giver of laws and the founder of institutions, but the educator and barometer of spiritual life. It wants to remake, not the forms of human life, but its content, man, character, faith. And to this end it requires discipline and

authority that can enter into the spirits of men and there govern unopposed. Its sign, therefore, is the lictors' roads, the symbol of unity, of strength and justice.'[20]

কয়েকটি ফ্যাসিস্ট-স্লোগানের নমুনা দেখে বোঝা যায় তাদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের নিহিত উদ্দেশ্যঃ

1) Discipline is the soul of armies; without it there are no soldiers, only confusion and defeat.

2) The enemy of Fascism is your enemy. Give him no Quarter.

3) The Fascist revolution has depended in the past and still depends on the bayonets of its Legionaries.'[21]

তদানীন্তন পৃথিবীতে এই মতবাদ প্রবল বেগেই যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেছিল, তার কথা প্রায় চাপা পড়ে, জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মুসোলিনির সাংগঠনিক তৎপরতা ও কার্যকারিতার ভূমিকা সগুণভাবে তাবৎ রাষ্ট্রে প্রচারিত হয়। ফলত দেখা যায়, স্পেন, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে 'ডিক্টেটারী' শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের 'হুজুগ' পড়ে যায়। নিষ্ঠুর প্রশাসনের আড়ালে ডুচের ইটালিতে কতজন ব্যক্তির বিচার হয়েছে, কতজন নির্বাসিত ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, কারাপ্রাচীরের ভেতরকার সেইসব তথ্য দিতে গিয়ে রোঁমা রোলাঁ বলেন, 'ইতালী পর্যটন শেষ করিয়া সম্প্রতি [illegible] ফিরিয়া যাহারা ফ্যাসিজম-এর গুণকীর্তন শুরু করিয়াছেন, যাহারা ইতালীর চির উজ্জ্বল আকাশে কখনো মেঘের ছায়া পর্যন্ত দেখেন নাই, কারাগারে কি নির্বাসনে কোথাও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামান্যতম বিক্ষোভও যাহাদের চোখে পড়ে নাই, তাহাদের উল্লিখিত বর্ণনার পরিপূরক বলিয়া নিম্নোক্ত সামান্য ঘটনা কয়টি যোগ করিয়া দিতে আমরা তাহাদের অনুরোধ করিতেছি।

ইতালিতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মোট ৩,৫০০ ব্যক্তির বিচার হইয়াছে। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তের সংখ্যা ২০০।

১৯২৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত নির্বাসিতের সংখ্যা ৩,০০০। সর্বসমেত মোট কারাবাস হইয়াছে ১২,০০০ বৎসরের। ১৯৩২ সালের হিসাবেঃ স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ২৭৭জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিচার করিয়াছেন। দণ্ডিতের সংখ্যা ২২০, ইহাদের দুইজনের মৃত্যুদণ্ড। ৭০০জন অতিরিক্ত নির্বাসিত। প্রায় ১০,০০০জনকে গ্রেফতার করিয়া কিছুকাল বন্দী রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৩ সালেঃ ৬১জনের অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা হয়। প্রায় ৬০০ নির্বাসিত হয়। ৫০০জন বিচারের জন্য প্রতীক্ষমান, গ্রেফতার হইয়া কিছুকাল কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন প্রায় ১,০০০জন।'[22]

দার্শনিক ক্রোচে মুসোলিনির কারাগারে দীর্ঘকাল যাপন করেন। শিক্ষয়িত্রী রাভেরা, রিয়া পিয়া-কাপানিয়া, কর্মিনা রুসেটি প্রমুখ নারীরাও এই অবিচার থেকে মুক্তি পান নি। আইনজীবী উম্বের্তো তেরাচিনি, সান্দ্রো-পের্তিন, রেকোলিনো কেরানি, ডাঃ মাউরো স্কচিমারো, প্রচ্ছদশিল্পী জিনো-লুসেত্তি, প্রাক্তন কমিউনিস্ট ডেপুটি দোমেনিকো মার্কিওরো, স নিবন্ধুর বাতিস্তা সান্তিয়াগো, ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ইটালীয় প্রতিনিধি আন্তোনিও গ্রামসি প্রমুখ ফ্যাসিস্ট-শাসনে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুন মাত্তেওত্তি হত্যার ঘটনা, ৬ এপ্রিল গুপ্তঘাতকের হাতে আমেন্দোলার মৃত্যুও বিশ্ববিবেককে বিচলিত না করে পারে নি। তখন বিশ্বের জনমত এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বৈরশাসনের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

এর পাশাপাশি হিটলারের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহনের ঘটনাটিও কিঞ্চিৎ চমকপ্রদ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানির অবস্থা, এক কথায়, হয়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদ (জার্মানিতে নাৎসীবাদ) প্রতিষ্ঠার যথার্থ অনুকূল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর জাগরণ ও সংগ্রাম যতই অনবদ্য হোক, কিংবা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চে প্রবীণ সেনাপতি ব্যারণ ফন লুৎভিৎস-এর রাজধানী দখলের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সর্বাত্মক ধর্মঘটের ফলে প্রেসিডেন্ট ফন কাপের পরাজয় সুনিশ্চিত হলেও এবং 'ভেইমার শাসনতন্ত্র' রক্ষা পেলেও যুদ্ধোত্তর জার্মানির অবস্থা ছিল সাত লক্ষ লোকের অপুষ্টি-জনিত মৃত্যুতে করুণ, তার দ্বিগুণ শিশুর মৃত্যুতে শোকাতুর, আধা লক্ষ বেকারের জঠর-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, ভার্সাই-সন্ধির প্রস্তাবে দেউলিয়া আর সুবিধাবাদী, নীতিভ্রষ্ট ও সংশোধনবাদী মনোভাবের রাজতন্ত্রী, রক্ষণশীল, ন্যাশনালিস্ট এবং সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ডে বিপর্যস্ত---এর সঙ্গে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'স্টক এক্সচেঞ্জ'-এর পতন, অর্থাৎ সব মিলিয়ে জার্মানির আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল।

জার্মানিতে হিটলার যেভাবে ক্ষমতায় আসীন হন, তার পদ্ধতিগত কয়েকটি দিক মোটেও অগণতান্ত্রিক নয়, কেননা জনপ্রতিনিধিদের মৌলসূত্র ধরেই তাঁর ক্ষমতায় আসা। হিটলারের দল 'National Sozialist Party' বা সংক্ষেপে নাৎসী (Nazi) দল। সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাইখস্টাগে ২৩০টি সদস্যপদ লাভ করে হিটলারের নাৎসীদল। প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ ন্যাশনালিস্ট দলের ফন প্যাপেনকে সরিয়ে জেনারেল ফন শ্লেইখারকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আহ্বান করলে পর হিটলার-এর সঙ্গে ফন প্যাপেন প্যাক্ট করে সক্রিয়তা অর্জন করেন, অতঃপর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী হিন্ডেনবুর্গ চ্যান্সেলারের পদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে হিটলারকে আহ্বান জানান। এর

থাকে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টরা 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠনের আবেদন জানায় সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের কাছে এবং দু'বারই প্রত্যাখ্যাত হয়।[23] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮জুলাই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ২০জন প্রবীণ সদস্য ব্যক্তির সঙ্গে এক আলোচনাকালে থার্লম্যান বলেন,'জার্মানিকে যখন আফ্রিকা ও চীনের দেশে পরিণত করা হচ্ছে এমন ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এমন পরিস্থিতিতে, একটি সংযুক্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রলেতারীয় ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা না করে আমরা, কমিউনিস্টরা, কী করতে পারি ?'[24] নাৎসীদের রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে ওঠার আগেও একাধিকবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ধর্মঘট আয়োজনের জন্যে জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছে কমিউনিস্টরা আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়।[25] তার মানে এই নয় যে ফ্যাসিবাদ আর সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি সমার্থক, যদিও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে মিঃ তোগলিয়াত্তি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি হল শ্রমিক ও পেটিবুর্জোয়া জনসাধারণের উপর ভিত্তিশীল একটি আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীগত ঐতিহ্যের সংগঠন।[26] তথাপি 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে নতুন নীতি অনুসৃত হচ্ছিল, ষষ্ঠ কংগ্রেস তা অনুমোদন করে।' ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কমিন্টার্নের নির্বাহী কমিটির একাদশ পূর্ণাঙ্গ সভা এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসে যে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সমস্ত বিকাশই ফ্যাসিবাদের অভিমুখে বিবর্তনের 'একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া'---ফলত, ইটালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবিরোধী শক্তিকে সম্মিলিত করবার পথে তা সবচে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাটি আর ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাটিকে একই দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছিল বলেই জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য রজনীপাম দত্ত তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় অংশের নেতৃত্ব ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের হাতে, এবং গোড়া থেকেই প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নঞর্থক ছিল তাদের ভূমিকা, সেই সুযোগে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়। রজনীপাম দত্ত লিখেছেন:

'This was not due to any superior or fighting strength of fascism, but was solely because the action of the workers was paralysed and prevented by their own majority leadership and by their own mistaken discipline and loyalty under that leadership. Fascism can, however, as the Italian example had already shown, only reach a mass basis after Social Democracy has fully exposed itself and created widespread mass disillusionment in the midst of

growing economic crisis and gathering revolutionary issues. This is the general background for the growth of Fascism.'[২৭]

হিটলারের নাৎসীবাদ প্রথম প্রচারিত হয় ১৯২০খ্রীষ্টাব্দে, বন্দীশালায় রচিত 'মেইন ক্যাম্ফ' রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর কয়েকটি দাবি অনুধাবন করলে তাঁর মতবাদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হবে। জার্মান-জাতির জাত্যপ্রীতিকে তিনি কিভাবে উস্কে দিয়েছিলেন, তাও বোঝা যাবে:

1. We demand, on the basis of the right of national self-determination, the union of all Germans to form one Great Germany.
2. We demand juridical equality for the German people in its dealings with other nations, and the abolition of the Peace Treaties of Versailles and St. Germain.
3. None but members of the nation may be citizens of the State. None but those of German blood, whatever their creed, may be members of the nation. No Jew, therefore, may be considered a member of the nation.'[২৮]

হিটলারের পঁচিশ দফা দাবির মধ্যে যুদ্ধপ্রীতি, জাতিবৈর বা শান্তি-সন্ধির বিরোধী কথাবার্তাই ছিল না, নিঃসন্দেহে কয়েকটি ভাল প্রস্তাবও ছিল। এগুলির অন্যতম হল ভূমিসংস্কারের প্রতিশ্রুতি, বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, শিক্ষার সুব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারদের কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্বদান ইত্যাদি। লক্ষ্য করবার, এসবের পাশাপাশি তিনি নরহত্যার বিষয়টিকেও একটি দার্শনিক ভিত্তি দিতে সচেষ্ট হন।[২৯]

১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের ১এপ্রিল থেকে জার্মানিতে অতঃপর শুরু হয় ইহুদি ও স্লাভদের বিরুদ্ধে জাতিগত বর্জন আন্দোলন। আইনস্টাইন কিংবা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মত খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিকদেরও দেশ ছেড়ে এ সময় পালাতে হয়। এর আগে ২৭ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) তারিখে রাইখস্ট্যাগ-অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বুলগেরীয় কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভ, পোপোভ, ট্যানেভ ও আর্নস্ট টর্গলারকে ৯মার্চ, ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩) ডিমিট্রভ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করে যে তীব্র বক্তৃতা দেন তা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে দেশে দেশে কমিউনিস্টদের সামনে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। বলেন, 'একটা জাতি যে পাঁচশো বছর ধরে বিদেশী শাসনাধীন থেকেও তার ভাষা, তার জাতীয় চরিত্র ভোলে নি, আমাদের

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক যারা বুলগেরীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং কমিউনিজমের জন্য লড়াই করেছে এবং করছে---সেই জনগণ কখনো অসভ্য বা বর্বর নয়। একমাত্র বুলগেরিয়ার ফ্যাসিবাদই অসভ্য এবং বর্বর। কিন্তু আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, কোন দেশেই বা ফ্যাসিবাদ এই সকল চরিত্র বহন করছে না?[৩০] এই মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তরা প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। রোমাঁ রোলাঁ লেখেন, ...'ডিমিট্রভের বীরমূর্তি ভবিষ্যতের পটভূমিকায় চিরদিন অনন্ত মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে।'[৩১] ইতিমধ্যে সারা জার্মানিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দানা বেঁধেছে। অন্যতম কমিউনিস্ট কর্মী থেলমানের গোপন বিচার (১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দ), হিটলারের ঝটিকাবাহিনীর ক্যাপ্টেন রোয়েম ও কিছু পদস্থ অফিসারের নিধন ইত্যাদি ঘটনা সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দের ২আগস্ট রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ এক করে দিয়ে জার্মানির সর্বময় অধিকর্তা হিসেবে হিটলার আত্মপ্রকাশ করেন। একই সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনীর 'কমান্ডার ইন চিফ অব দি আর্মড ফোর্সেস'ও হন। অতঃপর বাতিল হল 'ভেইমার সংবিধানে'র মৌলিক অধিকারগুলি।

জার্মানির ফ্যাসিবাদী অভিজ্ঞতাকে ফরাসী দেশেও হুবহুরকমভাবে অনুকরণের চেষ্টা হয় ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে। কিন্তু কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট শ্রমিক জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে ১২ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট, ১৪জুলাইয়ে পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের বিক্ষোভ প্রদর্শন, মিছিল, প্যারিস, লিল প্রভৃতি শহরে ব্যারিকেড ইত্যাদির মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে তখনকার মত রুখে দেওয়া সম্ভব হয়।[৩২] প্যারিসের নাগরিকদের প্রতি আবেদনে'[৩৩] রোমাঁ রোলাঁ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার আহ্বান জানান।

একদিকে দুর্বার ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে জনগণের প্রতিরোধাত্মক দুর্জয় সংকল্প---এই পটভূমিতে সরাসরি সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ডিমিট্রভ যখন বন্দী, রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারবুস, ডলোরেস ইবারুরি তোগলিয়াত্তি প্রমুখেরা তাঁর মুক্তির দাবিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলেন এবং তা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে। ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের ১০মে বার্লিনের রাজপথে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিজগতের খ্যাতিমান সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থগুলি পোড়ানো হয়। যাঁদের বই পোড়ানো হয় তাঁরা হলেন টমাস মান, হাইনরিখ মান, আর্নল্ড স্টিফান জুইগ, এরিখ মারিয়া রেমার্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, হেলেন কেলার, জ্যাক লন্ডন, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এইচ. জি. ওয়েলস, আপটন সিনক্লেয়ার, আঁদ্রে জিদ, এমিল জোলা, হ্যাভলক এলিস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং আরও অনেকের। বিশ্বের সংস্কৃতি জগতে এ একটা বড় রকমের আঘাত। এর বিরুদ্ধে প্রথমেই যাঁরা সোচ্চার হন এবং

প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন তাঁরা এইসব লেখক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ। রাজনৈতিক বিরোধিতার সঙ্গে এ পর্বে যুক্ত হল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিদের বিরোধিতা। এই সম্মিলিত প্রয়াস স্বতঃস্ফূর্ত একটি মঞ্চে সমবেত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জরুরি করে তোলে।

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র:

ফ্যাসিবাদ (Fascism) এমন একটা মতবাদকে বলা হয়ে থাকে যা কি না সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এমন কি মানবতার যা-কিছু উৎকর্ষ, সেসবের চূড়ান্ত শত্রু। সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের আদিম লালসা হিসেবে দেখেছেন। লোভ বা লালসা সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু ফ্যাসিবাদ এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার অসুস্থ ও বিকৃত দিক। পুঁজিবাদের গভীর সংকট থেকে এর জন্ম। যেহেতু এর জন্ম পুঁজিবাদের মধ্যে সেইহেতু তা শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রেরও শত্রু। সমাজতন্ত্র এর প্রধান শত্রু হলেও গণতন্ত্র বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রও এর মিত্র নয়। ফাইনান্স ক্যাপিটাল(Finance Capital)-এর প্রচণ্ড রকমের উগ্র, বিধ্বংসী, নগ্ন ও হিংস্র একনায়কত্বের অপর নামই হল ফ্যাসিবাদ।[৩৪] সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফ্যাসিবাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়।

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে অ-কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীমহল একে 'মধ্যবিত্ত আন্দোলন', 'একটি পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলন' হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেন।[৩৫] 'ফ্যাসিস্ট ইডিওলজি' শীর্ষক প্রবন্ধে জীভ স্টার্নহেল তাঁর একটি মত উল্লেখ করেছেন:...'the ideology was purely incidental and unimportant' , এই বক্তব্যের পেছনে আছে মুসোলিনি এবং হিটলারের স্বাভাবিক সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আগমন, এর ফলে তাঁদের মতবাদের গুরুত্বকে অত্যন্ত লঘু করে দেখেছেন স্টার্নহেল:...'once in power had not put doctrine into practice,and could therefore be characterized as nothing more than adventures and opportunists with neither creed nor principle.'[৩৬]

অন্যত্র তিনি ওসওয়াল্ড মোসলি'র ফ্যাসিজম সম্পর্কে একটি বক্তব্য উদ্ধার করেছেন---

...'a worldwide creed.Each of the great political faiths in its

turn has been a universal movement:Conservatism,Liberalism and Socialism are common to nearly every country...In this respect, fascism occupies precisely the same position.'[৩৭]

তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুগভীর স্তর থেকে এই মতবাদ উঠে এসেছে বলে ফ্যাসিবাদকে অ-রাজনৈতিকভাবে বা নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়নের চেষ্টার অর্থ ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা। ফ্যাসিবাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লেনিন 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র চতুর্থ কংগ্রেসে(১৩ নভেম্বর, ১৯২২) প্রদত্ত রিপোর্টে। ইটালির ফ্যাসিস্টদের কাছে আলোকপ্রাপ্তহীন ইটালির জনগণ নিরাপদ নয়, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।[৩৮]

ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইহা এক ধরনের উগ্র রাষ্ট্রসর্বস্ব মতবাদ, যাহা কমিউনিজম, লিবারেলইজম, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের একান্ত বিরোধী, অথচ ধনতন্ত্রের পাহারাদার ও পৃষ্ঠপোষক।'[৩৯] প্রসঙ্গত তিনি জে. হ্যাম্পডেন জ্যাকসনের একটি বক্তব্য উদ্ধার করেছেন: 'Once in power the Fascists must follow certain inevitable steps:first destroy the working class organisations,secondly muzzle the organs of democratic opinion,thirdly guarantee the profits of big business by organising comerce and industry on lines of monopoly capitalism,fourthly give employment to the workers and dividend to the shareholders by gigantic schems of rearment.'[৪০]

ফ্যাসিবাদের সঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শুরু হয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে(১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ জুলাই-১সেপ্টেম্বর)-র সপ্তম অধিবেশনে। আলোচ্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপী বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায়' শীর্ষক বিষয়। সেখানে বলা হয়, 'একটি ঐতিহাসিক ঘটনারূপে যুদ্ধের কারণ নিহিত থাকে মানুষের বদ্ধমূল 'স্বভাবে' নয়, সরকারসমূহের 'দুষ্ট' নীতিতেও নয়---বরং একাধিক শ্রেণীতে তথা শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজের বিভক্ত অবস্থায়। পুঁজিবাদই---আধুনিক ইতিহাসে যুদ্ধের কারণ।'[৪১]

97892
3 JUN 1988
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

আলোচনা হয় ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা ও তার সামাজিক শেকড়, 'ফিনান্স পুঁজি' কথাটি নিয়ে। প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে সর্বত্র 'ফ্যাসিবাদ' শব্দটি ব্যবহারের বিরুদ্ধেও কেউ কেউ আপত্তি তোলেন: 'ফ্যাশিবাদকে পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার একমাত্র রূপ বলে মনে করা যায় না। বিভিন্ন দেশে বৃহৎ বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যা ইতালীয় ধরনের ফ্যাশিবাদ থেকে ভিন্ন।' ...'প্রকৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণকে অবহেলা করা এবং সোশ্যাল-ফ্যাশিজম, ফ্যাশিবাদী বামপন্থী জোট, ফ্যাশিস্ট সরকার প্রভৃতি ধরনের নির্বোধ শ্রেণীবিভাগে সন্তুষ্ট থাকার' প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি প. সেমার।[৪২] ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কমিন্টার্নের নির্বাহী কমিটির একাদশ পূর্ণাঙ্গ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যকার বিরোধকে ছোট করে দেখার ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছিল পরবর্তীকালে স্বীকার করা হয়।[৪৩] ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ-প্লেনামে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটি ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেন: 'fascism in power is the open terrorist dictatorship of the most reactionary, most chauvinistic and most imperialist elements of finance capital'.[৪৪]

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে(১৯৩৪) জে. ভি. স্ট্যালিন বলেন যে, ফ্যাসিবাদ শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার লক্ষণ নয় অথবা সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির বিশ্বাসঘাতকতা, এটি বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতা, স্বরাষ্ট্রনীতিতে সন্ত্রাসবাদ ও নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে পরিণামে যুদ্ধের নীতিতে আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে।[৪৫]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস(১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দ, ২৫জুলাই-২১অগাস্ট) জর্জি ডিমিট্রভের থিসিস গ্রহণ করে। এই থিসিসই 'যুক্তফ্রন্ট' থিসিস নামে খ্যাত। ফ্যাসিবাদের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ দেখতে পান জার্মানির ফ্যাসিবাদে, বলেন, 'It has the effrontery to call itself National-Socialism, though having nothing in common with Socialism. Hitler-fascism is not only bourgeois nationalism, it is bestial chauvinism. It is a government system of political banditry, a system of provocation

and torture practised upon the working class and the revolutionary elements of the peasantry, the petty bourgeoisie and the intelligentsia. It is medieval barbarity and bestiality, it is unbrindled aggression in relation to other nations and countries'.[৪৬]

তিনি আরও জানান যে, জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্যত খড়্গ হিসেবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হিসেবে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতি জনতার মহান পিতৃভূমি (the great father-land) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

ডিমিট্রভ মনে করেন, পুঁজিবাদই বস্তুতপক্ষে ফ্যাসিজমের নিহিত শক্তিস্বরূপ। তিনি বলেন,

'Fascism is the power of finance capital itself. It is the organisation of terrorist vengeance of the peasantry and intelligentsia. In foreign policy, fascism is chauvinism in its crudest form, fomenting the bestial hatred of other nations'.[৪৭]

ফ্যাসিজম প্রবঞ্চনারও বস্তু। এ কথা স্পষ্ট করে ঘোষিত হয়। ফ্যাসিজমের লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণকে বল্গাহীন শোষণ করা এবং এই শোষণ চলে বিভ্রান্তি আর উগ্রজাতীয়তাবাদের পথ ধরে ভণ্ডামিপূর্ণ প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে।

ডিমিট্রভ ফ্যাসিজমকে এইভাবে চিহ্নিত করেন।

এই চিহ্নিতকরণের পরে ডিমিট্রভ কতকগুলি কার্যসূচী রূপায়ণের প্রস্তাব রাখেন যা সূচনা করে যুক্তফ্রন্টের, সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই কার্যক্রম সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে একটি বাস্তব ভিত্তি তথা অতীত অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূল কার্যক্রমের অন্যতম অংশবিশেষ হল:

ক) সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, ক্যাথলিক, নৈরাজ্যবাদী এবং সিন্ডিক্যালিস্ট প্রভাবিত সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের ঐক্য,

খ) কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও অফিস কর্মচারীদের ফ্যাসিবিরোধী জোট গঠন,

গ) ঔপনিবেশিক দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোট গঠন,

ঘ) শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে যাতে প্রত্যেক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একটি গণপার্টি গড়ে উঠতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ- বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ও পপুলার ফ্রন্ট গঠনের প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। শ্রমিক, মেহনতি জনতা, সেইসঙ্গে যুবক, মহিলা, এঁদেরও একই প্রেরণায় সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। 'কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট', 'কালচারাল অ্যাকটিভিটিস' ও 'স্পোর্টস' প্রভৃতির ওপরও তিনি যথেষ্ট জোর দেন। যুক্তফ্রন্ট- হিসেবে তিনি দূরদর্শীভাবে জনগণের সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, সংস্কৃতিকে কলুষিত করে রেখেছে পচনশীল একচেটিয়া পুঁজিবাদ আর বর্বর ফ্যাসিবাদ তাকে বিনষ্ট করার নেশায় মেতে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সংস্কৃতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারে। তার রূপ হবে জাতীয় এবং অন্তর্বস্তু হবে সমাজতান্ত্রিক।[৪৮]

স্পেনের গৃহযুদ্ধ: রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও টোটেলিটারিয়ান শাসনের মাধ্যমে ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করে ও বুর্জোয়া- পদ্ধতির মধ্য থেকে উদ্ভাবিত সমস্তরকমের সংকট জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়াই চূড়ান্ত মুক্তির পথ বলে মনে করে জার্মানি ও ইটালির প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা। নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, অনেক দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ফ্যাসিবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধে বস্তুত তারই অনুকরণ ঘটে।

১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে স্পেনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে 'পপুলার ফ্রন্ট'(রিপাবলিকান, সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট দলের সংযুক্ত মোর্চা) লাভ করে ২৫০টি আসন এবং ফ্যাসিস্ট ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা পায় ২০৫টি আসন। 'পপুলার ফ্রন্টে'র ভেতরে সর্বাধিক ভোট পায় রিপাবলিকান দল--- ১৫৮টি, কাজেই এই দলের তরফে প্রধানমন্ত্রী হন কাসারেস কুইরোগা। বলা দরকার, এই সরকার একেবারে বামপন্থী রাজনীতিযুক্ত ছিল না, তবুও নতুন সরকার ভূমিসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে যে জরুরি পদক্ষেপ নেয় তা রক্ষণশীল ও কায়েমীস্বার্থের পরিপন্থী ছিল। তাছাড়াও, এই সরকারের ভেতরেও ছিল খানিক দুর্বলতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বকলহ।[৪৯] কাজেই স্পেন হয়ে উঠেছিল নানাভাবে ও নানাদিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশেষ দুর্গ। অনেকের ধারণা এই যে, জনকল্যাণমুখী কিছু কিছু কাজ হলে(যেমন 'পাবলিক-ওয়ার্ক', 'ইরিগেশন' বা 'হাউসিং স্কীম' ইত্যাদি) স্পেন এই গৃহযুদ্ধ রোধ করতে পারত।[৫০] এদিকে এই অন্তর্কলহের সুযোগে ফ্যাসিস্টদের তরফে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান সহজতর হয়ে ওঠে। পীল রোবলসও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে ওঠেন। ১৮ জুলাই(১৯৩৬)-এ চীফ অব দ্য জেনারেল

স্কো' ফ্রাঙ্কো রিপাবলিকান গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অধিকাংশ সৈন্যদল এবং মুর সেনাবাহিনী ফ্রাঙ্কোকে সহযোগিতার হাত বাড়ায়।

অন্যদিকে ইটালি ও জার্মানি এই গৃহযুদ্ধকে অবলম্বন করে মেতে ওঠে। কারণ স্পেনে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষিণে ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের জিব্রাল্টার প্রণালীর জলপথ বিপন্ন হবে। ইটালি এই গৃহযুদ্ধে লক্ষাধিক সৈন্য পাঠায় আর জার্মানি দেয় নব নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও স্বেচ্ছাসৈনিক। এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদুটির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধঃ প্রথমত একটি সমধর্মী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীকে জোরালো করে তোলা এবং দ্বিতীয়ত তারা যে-সমস্ত নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেছে তার প্রক্রিয়াগত কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা। সোভিয়েত সরকার স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য ও বিমান দেয়। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্যের ও হস্তক্ষেপের ফলে যদি মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে সেই আশঙ্কায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স 'নন-ইন্টারভেনশন'-নীতির সুবাদে ঘটনা থেকে সরে থাকে। ইতিমধ্যে সমগ্র স্পেনীয় মরক্কোসহ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করে। ভালাদোলিদ, পালেনসিয়া প্রভৃতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় ও সেইসঙ্গে বুর্গোস, আভিলা এবং গালিসিয়া বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। মাদ্রিদ এবং বার্সিলোনার সামরিক চৌকিগুলিতে বিদ্রোহীরা অনুপ্রবেশ করে। আয়ত্তের বাইরে চলে যায় স্পেনের সামগ্রিক পরিস্থিতি। কাসারেস প্রেসিডেন্ট আজানার কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই এক বেতার-বক্তৃতায় স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী ডলোরেস ইবারুরি রণধ্বনি তোলেন---'নো পাসারন'। পার পাবে না। বললেন, 'দস্যুদের বিজয়ী হতে কিছুতেই দেব না।'[৩১] এই স্লোগান স্পেনের ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামে তীব্র জোয়ার আনে।

* * *   * * *   * * *

স্পেনের ঘটনা, ফ্যাসিবাদের এক বিধ্বংসী ও বিপজ্জনক ঘটনার চূড়ান্ত-পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সর্বনাশ ও বিপুল বিনষ্টি বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ফ্যাসিবাদ কী ভয়ঙ্করভাবেই না সমুদ্যত। স্পেনের ঘটনায় বিচলিত হন বিশ্বের তাবৎ বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী ও সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অনুভব করেন একটি মঞ্চে সমবেত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। 'যুক্তফ্রন্ট-কার্যক্রমে'র গুরুত্বও এতদিনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ-না-করার নীতি নিয়েও এ পর্বে সন্দেহের ঝড় ওঠে, এর প্রতিক্রিয়া বিশ্বজনমত গঠনেরও প্রেরণা হিসেবে দেখা দেয়।

কিন্তু, স্পেনের ঘটনা ঘটবার আরও অনেক আগে থেকে বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীরা জনমত গঠনে,

গণতন্ত্রের সপক্ষে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য সংগঠিত করে আসছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'চিন্তার স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা'র [৫২] মাধ্যমে রাষ্ট্রের পদতলে উৎসর্গীকৃত বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পীদের স্বাধীনচিন্তার সপক্ষে কথা বলবার আহ্বান দিয়ে যে প্রতিরোধাত্মক অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন তা সেখানেই থেমে থাকে নি। ১৯২৬খ্রীষ্টাব্দের ১৯এপ্রিল ফরাসী দেশের একটি সংগঠন 'ফ্রেঞ্চ লীগ অব দ্য রাইটস অব ম্যান'(অন্যত্র এই সংগঠনটি 'ফ্রেঞ্চ লীগ ফর দ্য রাইটস অব ম্যান' নামেও উল্লিখিত)-এর কাছে প্রেরিত একটি বাণীতে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' [৫৩] অভিযান, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫জানুয়ারী 'ইন্ডিয়ান ডেলি' প্রেরিত বাণীতে [৫৪] ভারতে ফ্যাসিজমের প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ ইত্যাদি সেই অভিযাত্রারই অব্যাহত প্রতিস্পর্ধারূপে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২৭খ্রীষ্টাব্দের ২০ফেব্রুয়ারী ব্রাসেলসের সাল-বুসিয়েলে প্রথম বৃহৎ ফ্যাসিজম-বিরোধী সভার অধিবেশন হয়। এবং আইনস্টাইন, আঁরি বারবুস ও রোমাঁ রোলাঁর প্রধান উদ্যোগেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রোলাঁ। 'লীগ ফর দ্য রাইটস অব ম্যান'-এর সহসভাপতি পদ তাঁরা কার্যকরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [৫৫]

ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে আরও একাধিক সংগঠন। এগুলির অন্যতম 'ইন্টারন্যাশনাল লীগ অব উইমেন ফর পীস এ্যান্ড লিবার্টি', 'লীগ ফর দ্য ফাইটার্স ফর পীস' প্রভৃতি। 'ওয়ার্ল্ড লীগ ফর পীস'-এর (জেনিভা) ডিরেক্টরের তরফে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর চেয়ে একটি পত্র প্রকাশিত হয়, অংশবিশেষ এখানে উল্লিখিত হল।-

<u>Ligue Mondiale pour La Paix, Geneva,</u>

<u>Le 13 juin, 1928.</u>

Honoured Sir,

Be pleased to permit us to approach you through the esteemed personality of Monsieur Romain Rolland, to pray that you be gracious enough to grant us an autograph for the Golden Book of Peace.

This work will consist of reproductions of the thoughts on peace from the most illustrious personages and the most eminent writers of each country.

We have received, upto this day, for this book, over 270 documents, among which are the autographs of Messrs. Heriot, Briand, Paul-Boncour, Poincare, Brieux, Marcel Prevost, Chamberlain, Stressemann, Ador, Henri Barbusse, Maurice Donnay, Vandervelde, Charles Richet, Quiddle and others.

Be kind enough, honoured monsiuer, to accept the expression of our great admiration and the assurance of our profound gratitude.

(Sd-) Georges Deyean, Director, Ligue
Mondial Pour La Paix.[৩৬]

লাইঅনসে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ বিরোধী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন(১৯৩১খ্রীষ্টাব্দ, ১-৪অগাস্ট)-এ প্রেরিত এক বাণীতে অধ্যাপক আইনস্টাইন যুদ্ধের উত্তেজনার দিকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন, এবং আশা রাখেন এর অবসান হবে বলে। তাঁর বাণীর মর্মার্থ:

Professor Einstein's Appeal

I address myself to you, the delegates of the War Resisters' International, meeting in Conference at Lyons, because you represent the movement most certain to end war. If you act wisely and courageously, you can become the most effective body of men and women in the greatest of all human endeavours. Those you represent in fifty-six countries have a potential power far mightier than the sword. 'I appeal especially to the intellectuals of the world. I appeal to my fellow-Scientists to refuse to co-operate in research for war purposes. I appeal to the preachers to seek truth and renounce national prejudices. I appeal to the men of letters to declare themselves unequivocally. I ask every newspaper which prides itself on supporting peace to encourage the peoples to refuse war service. I ask editors to challenge men of eminence and of influence by asking

them bluntly :

'Where do you stand? Must you wait for everyone else to disarm before you put down your weapons and hold out the hand of friendship?'[৩৭]

'দ্য নিউ রিপাবলিক' পত্রিকাটি ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দের দিকে জাপানি-সাম্রাজ্যবাদের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশ্বপরিস্থিতির এহেন জটিল অবনতির পাশাপাশি শান্তির জন্যে যে নতুন পথে বিশ্বের বিবেকী মানুষেরা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলবেন সে সম্বন্ধে একটি সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য:

A World Congress Against War

'In a situation like this, it is heartening to learn that a peace movement is being started along new lines. An international committee headed by Henri Barbusse, Albert Einstein, Romain Rolland, Heinrich Mann, H.G. Wells, Bernard Shaw, Maxim Gorky and Mme Sun Yat-sen, has called for the organization of a World Congress against war. The Congress is to be composed, not of statesmen, but primarily of people who fought in the last war or would be forced to fight in the next. There will be representatives of labour unions in all countries — especially of unions organized in the various war industries — as well as members of peace societies. They will meet in Geneva on August 1, not far from the building where diplomats have been conducting their long debates ... This is a time moreover, when such an appeal might be decisive.'[৩৮]

১৯৩২খ্রীষ্টাব্দের ১জুন রচিত 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' শীর্ষক রোমাঁ রোলাঁর একটি আবেদন প্রকাশিত হয় মডার্ন রিভিউ'র অগাষ্ট সংখ্যায়। সম্ভবত আমস্টার্ডমে যুদ্ধ বিরোধী বিশ্বসম্মেলনের প্রাক্কালে বুদ্ধিজীবী, জনগণ,

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ও রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনের প্রত্যাশায় ও সম্মেলনটিকে সফল করে তোলবার আকাঙ্ক্ষায় এটি রচিত ও প্রচারিত। রোলাঁর আবেদনের বয়ানঃ

'War is coming, coming from all the quarters. It menaces all nations. It may burst upon us tomorrow. If it sets on fire one corner of the world, it can no longer be localized... It will be the nameless thing, the destroyer of the entire civilization...

'We give the alarm, Awake ! we appeal to all nations, to all parties, to all men and to all women, who are right-minded. There is no question here of the interests of a particular nation, class or party. Everything is at stake ... Let us all unite against the common enemy. Attack war ! Let us put a stop to it.

'We wish to make the will of nations — of whatever is sane in humanity, thunderingly articulate. Let them stand up against the contemptible and equivocal failure of Governments to chain the iniquitous instigators of war, — the armament manufacturers, their whole clientele of agents provocateurs, the low Press, and the rabble which intrigues for war in order to fish in blood-stained waters. Let us muzzle war !

June 1, 1932 Romain Rolland [২৯]

১৯৩২খ্রীষ্টাব্দের ২৭-২৮অগাস্ট দু'দিনব্যাপী আমস্টার্ডমে যুদ্ধ বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়্যার) অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রোলাঁ। তিনি লিখেছেন, 'আমস্টার্ডমে সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সঙ্গে জড়িত।'[৩০] ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দে ৬ফেব্রুয়ারী প্যারিসে সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এবং ইউরোপের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে

'ফ্যাসিবিরোধী শ্রমিক কংগ্রেস'(এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ওয়ার্কার্স কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নরওয়ে, ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, পোল্যান্ড ও জার্মানির শ্রমিক, লেবার, সোশ্যালিস্ট, স্বাধীন সোশ্যালিস্ট প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করে।-'এই সম্মেলন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্তর্জাতিকের নিকট ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই দুই আন্তর্জাতিকের একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব পেশ করে।'[৬১] ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্টবিরোধী কমিটি'র প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন প্যারিসের সুলা প্লেয়েলে অনুষ্ঠিত হয়। রোমাঁ রোলাঁ এতে সভাপতিত্ব করেন। প্লেইয়েল হলে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস 'ইউরোপের তিন লক্ষাধিক মেহনতী মানুষের কমিউনিস্টদের, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিকদের একটি অংশের এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছিল। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং মেহনতীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক দাবিসমূহের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য এই কংগ্রেস একটি ব্যাপক কর্মসূচী উত্থাপন করে। পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে যারা ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদে এবং জাতিসমূহের উপর নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী হত্যাযজ্ঞ নিবারণের কাজে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তেমন সকল ফ্যাসিস্টবিরোধীর একটি ব্যাপক-ভিত্তিক সংগ্রামী সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনের ধারণাই ছিল এই কংগ্রেসের মূল সুর।'[৬২] ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে ফ্যাসিস্টবিরোধী কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্ডম কংগ্রেসে গঠিত বিশ্ব শান্তি-সংগ্রাম কমিটি মিলিত হয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গঠন করা হয় যুগ্ম বিশ্ব কমিটি। আমস্টার্ডম-প্লেইয়েল আন্দোলন নামে খ্যাত এই আন্দোলন 'জার্মান ফ্যাসিবাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজে, ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে ইউরোপের মেহনতী মানুষদের সম্মিলিত করার ক্ষেত্রে' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬৩]

১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়ার', অপরটি ২১জুন অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব রাইটার্স'। আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল সরাসরি ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জেহাদ। মূল উদ্যোক্তা ম্যাক্সিম গোর্কি, অঁরি বারবুস ও রোমাঁ রোলাঁ। আন্তর্জাতিক প্রগতিপন্থী লেখকদের এটি প্রথম অধিবেশন। অবশ্য এর আগে অনুরূপভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে খার্কভ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন লুই আরাগঁ, জর্জ সাদুল প্রমুখ বহিরাগত লেখকগণ। বলাই বাহুল্য, খার্কভ ও মস্কো লেখক কংগ্রেস(১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দ) মূলত অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট লেখক-প্রতিনিধিদের দ্বারা। ২৬অগাস্ট, ১৯৩৪

খ্রীষ্টাব্দের সকালবেলাকার অধিবেশনে কার্ল রাদেকের উত্থাপিত 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য'-সংক্রান্ত ('Resolution on the Report of Karl Radek on International Literature') একটি প্রস্তাবে সারা বিশ্বের লেখকদের আহ্বান জানিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনীকে চালনা করার কথা বলা হয়:

'The Congress of Soviet Writers calls upon its brothers, the revolutionary writers of the whole world to fight with all the force of the writer's pen against capitalist oppression, fascist barbarism, colonial slavery, against the preparations for new imperialist wars, in defence of the U.S.S.R. — the fatherland of toiling humanity.'[৬৪]

বাস্তবিক, এই সম্মেলনেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল প্যারিসের আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে। এখানে উপস্থিত ছিলেন আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জুলিয়া বেন্দা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ। আঁদ্রে জিদ তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি দৃঢ় আস্থা ঘোষণা করেন এবং সংস্কৃতির শত্রুদের চিহ্নিত করে বলেন, 'আমি দৃঢ়স্বরে বলি, তারাই হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান মিথ্যাচারী সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, আমি দৃঢ়স্বরে বলি, সংস্কৃতির শত্রু আজ ফ্যাসিস্তরা, নাৎসীরা, এবং আমাদের স্বদেশের জাতীয়তাবাদীরা।'[৬৫]

ই. এম. ফর্স্টার বলেন, 'বর্তমান সঙ্কটের প্রতিবিধান সম্বন্ধে মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি তন্ময় ও সংবেদনশীল হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্তব্য সে পালন করেছে, আসন্ন দুর্যোগে মানবজাতিকে সতর্ক করতে সে সহায়তা করেছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে-নির্ভীক চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বর্ধিত করবে।'[৬৬]

প্যারিস-সম্মেলনের পর অনুরূপ সম্মেলন হয় লন্ডনে। ইংরেজ ও ভারতীয় লেখকগণ সম্মিলিতভাবে প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠন করেন। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ই. এম. ফর্স্টার। অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ট রীড, ডক্টর মুল্কাটার, মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ফ্রান্সে অধ্যাপক ল্যাঞ্জেভিন, পল রিভেট প্রমুখের দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে

গঠিত 'ডিফিন্যান্স কমিটি'র প্রথম অধিবেশন হয়ঃ

'It declared formally that to guarantee world peace it was necessary

(1) that disarmament should be simultaneous and controlled,

(2) that the territorial and economic injustices should be redressed, and

(3) that the manufacture and private sale and exportation of armaments should be interdicted.

Mon. Grumbach of the French Socialist Party, Mon. Henri Rolin of the Belgian Labour Party, and Mon. Leon Jouhanx jointly affirm that the labour movement welcomes Peace. The Quaker group (Society of Friends) also issues an eloquent appeal through Mr. E. Van Etten. There should be national demonstrations culminating in the Universal Peace Congress so that 'the year 1936 should not be the dark year of world war but the glorious year of victory over the forces of destruction.'[৩৭]

'লীগ অব নেশনস'র 'দ্য কমিটি অব ফাইভ' ও 'দ্য কমিটি অব দ্য থার্টিন'-এর প্রেসিডেন্ট মিঃ মাদারিয়েগা তাঁর একটি বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করেন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশের এতে যথেষ্ট সাড়া মেলে। রবীন্দ্রনাথ, করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সমর্থন প্রার্থনা করে ভারতীয় সংবাদপত্রেও সেই বাণী প্রচারিত হয়।-

'Peace is not a passive or finished stage, a sort of a Dead Sea wherein the currents of History would find their quiet death. On the contrary, Peace represents the highest activity of mankind pressing into its service some of the noblest functions of the human soul. Peace presupposes the continual creation of new values,

new emotions, new ways of thinking. With that price alone we may hope to keep alive the new institutions of Peace. In short Peace is the highest and the most difficult form of World Revolution.'[৩৮]

১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দের ৩সেপ্টেম্বর ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস(The Brussels World Peace Congress)। এতে অংশ গ্রহণ করেন পঁয়ত্রিশটি দেশের চার সহস্রাধিক প্রতিনিধি, সাতশ' পঞ্চাশটি জাতীয় ও চল্লিশটি আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ভি. কে. মেনন, ভারতীয় স্বরাজ দলের পক্ষে বি. ব্যানার্জি(লন্ডন), এবং সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষে ডক্টর মুলকরাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বাণী ছাড়াও সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকেও একটি বাণী প্রেরিত হয়। এ ছাড়া, এই কংগ্রেসে যে সমস্ত সংগঠনগুলি যোগদান করে তার অন্যতম--

'The Churches, the ex-service men, the Trade Union and the Co-operative Movement are joined with intellectual, faminine, agrarian and youth organizations and with every political party: Conservative, Liberal, Democratic, Socialist and Communist.'[৩৯]

সভ্যতার ইতিহাসে বর্বরতার পুনরাবৃত্তি তখনই ঘটে চলছিল, ১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাসের হত্যাকান্ড, জাপানের চীন-আক্রমণ, ১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ, জার্মানির ভার্সাই-সন্ধি ভঙ্গ, বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি(১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দ, ১৬মার্চ)প্রবর্তন, ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান(১৭-১৮জুলাই) ইত্যাদি। স্পেনের ঘটনার পর বুদ্ধিজীবীরা সরাসরি যেন আত্মসমালোচনার মুখোমুখি হয়ে পড়েন। ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের সংঘাত স্পেনের ঘটনায় যেভাবে ফুটে ওঠে তাতে বুদ্ধিজীবীদের প্যাসিফিস্ট থাকবার আদর্শও ভেঙে পড়ে। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী বিশ্বকমিটির পক্ষে ফ্রাঁসিস জুরদাঁ ও রোলাঁ গভীর উদ্বেগ নিয়ে স্পেনের ঘটনায় সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। জুরদাঁ 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রোলাঁর একটি আবেদন প্রকাশের কথা বলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁকে একটি পত্রও দেন। পত্রটির অংশবিশেষঃ

1st December, 1936

Ramananda Chatterji Esq.,
"Modern Review"
Calcutta

Dear friend,

'We feel sure that you will associate yourself with this appeal and therefore we make so bold as to ask you to send us a few lines expressing your opinion on the terrible bombardment which the civilian population in Madrid has endured already for so many days.

We attach particularly great value to such a personal declaration from you. Its publication in the press and particularly in Spain will be an important testimony to word opinion and a mark of solidarity with the Spanish people.

Thanking you in anticipation,
Yours sincerely
For The World Committee Against
War And Fascism
P.P. Francis Jourdain.'[40]

রোলাঁর আবেদনের অংশবিশেষঃ

To All the Peoples

Come To The Help Of The Victims Of Spain !

'A cry of horror rises from the smoking stones of Madrid. The proud city, once queen of half the Old World and the New and one of the radiant centres of Western civilization has been put to fire and

sword by an army of African Moors and legionaries, whose rebel leaders dare to claim for themselves the cause of the Spain which they are plundering, and of the civilization which they are trampling underfoot.

Thousands of women and children have been massacred, mutilated, burnt alive. The crowded quarters of the city are the chief targets. Hospitals have not been spared. Glorious palaces are inflames : today the Palace of the Duke of Alba, tomorrow the Prado. Centuries of art crumble under the bombs. Valasquez dies with his people ...

'Humanity ! Humanity ! The appeal is to you. The appeal is to you, men of Europe and America. Come to the help of Spain ! For it is you, it is all of us who are menaced. Do not allow these women, children and world treasures to perish. If you remain silent now, tomorrow it will be your children, your wives, all that you hold dear, everything which makes life beautiful and sacred, that will perish in its turn....

'Quick ! Quicker still ! Rise, speak, cry out, act ! If we are not able to stop the war, let us compel respect for the rules which international conventions impose. Let us save the helpless and innocent ! ....

20th November, 1936 Romain Rolland ৭১

স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতির আবেদন জানিয়ে রোমাঁ, বারবুস ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে 'SPAIN' শীর্ষক একটি পুস্তিকা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই গৃহযুদ্ধে বলি হন কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, [illegible]। এঁদের মৃত্যু অনেককে ব্যথিত করে তোলে।

ইতিমধ্যে গঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড'। 'পপুলার ফ্রন্টকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এই ব্রিগেড। পৃথিবীর চুয়ান্নটি দেশের চল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। ব্রিগেডে ইউনিট ছিল পাঁচটি---এগার থেকে পনের নম্বর। জার্মান স্বেচ্ছাসেবকদের এগার নম্বর ব্রিগেড থেলমান-এর নামে গড়ে ওঠে, এতে ছিলেন ফ্রানৎস ডাহলেম, হানস বেইমলার, হেনরিখ রাউ, গুস্তাভ ৎসিন্দা, হাইনৎস হফমান, লুই শুস্টার, লুডভিগ রেন, হানস কাহলে প্রমুখ। বার নম্বর ব্রিগেড জার্মান, ইটালি, ফরাসীদের (সকলেই ফ্যাসিবিরোধী) নিয়ে গঠিত। গ্যারিবল্ডির নামে এই ব্রিগেডে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা লুইজি লঙ্গো, সোশ্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো, দ্যভিত্তোরিও ভিদালি, পাচিয়ার্দি, রোসেল্লি। পোল, চেক ও স্লাভ ভাষাভাষিদের নিয়ে তের নম্বর ব্রিগেডের নাম দমব্রাউস্কি। চোদ্দ নম্বর ফ্রাঙ্কো-বেলজি ব্রিগেড, এতে ছিলেন ফরাসী ও বেলজিয়ানরা, যথা---দুরঁ, আঁদ্রে মার্তি, কাবিয়েন, জাঃ রকে, আঁদ্রে মালরো, রল তাঙ্গি প্রমুখ। পনের নম্বর লিঙ্কন ব্রিগেড। এটি শেষ পর্যন্ত চারটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ হয়। তিনটি ইংরেজভাষী, চতুর্থটি স্প্যানিশ। প্রথমটিতে ইংল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গড়া শাকলাতওয়ালা ব্যাটেলিয়ন। এই ব্যাটেলিয়নে ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী ফেলিসিয়া ব্রাউন, র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড, ক্লাইভ ব্রানসন, ভারতীয় কৃষককর্মী ও নেতা গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার আর ছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ। দ্বিতীয়টি কানাডিয়ানদের নিয়ে ম্যাকেঞ্জি পাপিনো ব্যাটেলিয়ন। তৃতীয়টি কিউবা, মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত। চতুর্থটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গড়া আব্রাহাম লিঙ্কন ব্যাটেলিয়ন। বলাই বাহুল্য, সামরিক শিক্ষাহীন এঁদের অনেককেই স্পেনের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়। কর্নফোর্ড, র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল প্রমুখ অনেকেই নিহত হন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, লেখক-শিল্পী সম্প্রদায় দু'ভাবে কাজ করেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে অংশ গ্রহণ, দ্বিতীয়ত, স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে প্রচার চালানো, অর্থসংগ্রহ, ঔষধ-বস্ত্র-আহার্য ও নানাপ্রকার সাহায্য দিয়ে ও নিরপেক্ষ-নীতির আদর্শে অবিচল বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করে।

এইভাবে রাজনৈতিক সংকটে সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধি ও প্রতিভূরা এসে সম্মিলিত হন। এই সম্মিলন সাহিত্যজগতে ও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই পর্বে শিল্পজগতে শিল্পীর স্বাধীনতা ও অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিও। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটের সময়ই এই প্রশ্নটি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একাংশকে এক

নবীন জিজ্ঞাসায় উন্মুখ ও কৌতূহলী করে তোলে, এবং অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গেই যে শিল্পরূপেরও অনিবার্য ও অন্তরঙ্গী সম্বন্ধ সে-সম্পর্কে অতীত ধারণার অবসান-সূচনা করে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগত পরিবর্তন এনে দেয়। বস্তুত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপলব্ধিই সর্বোচ্চ মর্যাদার সঙ্গে, সচেতন ও সর্বাত্মক প্রতিবাদের আবেগ থেকে উৎসারিত ও উচ্চারিত হয়।

---

১ এ পর্বের কবিতার সাধারণ নমুনাঃ

রোমাঁ রোলাঁ ঠিকই লিখেছিলেন, 'আজ আর্টের আদর্শ ও সমাজসংগ্রামের মধ্যে মিলনের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্টের সুর আজ আর প্রতিভার ধ্যানদৃষ্টি নহে, সে-সুরে আজ বাস্তবের ঠাসবুনানি। বাস্তব জগতেই সে-সুর আজ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। মানুষের মনে আজ এক সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়াছে--- নিরাপত্তার অনুভূতি, আজ আর আগের মত মানুষ জলের উপর হাঁটে না।'[৭২]

তিরিশের সংকটময় দশকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এবং সব ভাষাতেই আর্টের আদর্শ আর সমাজ-সংগ্রামের মধ্যে গড়ে উঠেছিল মিলনের সেতু। ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান ভাষাতেই নয়, চেক, পোল, স্প্যানিশ, এমনকি তুর্কি ও ইরানি ভাষাতেও আন্তর্জাতিক সংকটগুলি যে প্রবল মানবিক আবেগ সঞ্চার করেছিল, তার ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সূচিত হয়ে উঠেছিল সুনিশ্চিত প্রতিরোধ আর নিরাপত্তার অনুভূতিতে জারিত হয়ে।

ইংরেজি সাহিত্যে এটা কিভাবে ঘটে উঠেছিল সে-সম্পর্কে বলতে গিয়ে হগ্. ডি. ফোর্ড বলেন,

'By 1936, what could only be described as a formidable proletarian movement in British literature, especially the poetry, was well-established and flourishing. The successful launching of the Left Review, in 1934, and of New Writing and the Left Book Club, in 1936, assured not only the Audenites but all the left-wing poets, representing all poetical — political positions, of a bigger audience.'[৭৩]

এর ফলে কবিরা এলেন মানুষের এবং মাটির কাছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ এ-ব্যাপারে কবিদের কাছে এক মস্তবড় প্রেরণা নিয়ে উপস্থিত হল। এক লেখকের চোখে স্পেনের ঘটনাটা এইরকমঃ

'The Spanish War is a gloomy milestone for creative writers, marking as it does the second descent of the twentieth century into the violence of international anarchy, a descent made more destructive for them by the confusion of warring ideologies with warring empires.'[৭৪]

স্পেনের গৃহযুদ্ধ কবিদের বা অন্যান্য সাহিত্যিকদের কাছে কতটা গভীর প্রেরণার বিষয় হয়ে উঠেছিল, কয়েকজনের মন্তব্যে তা স্পষ্ট হবে। স্টিফেন স্পেন্ডারের ভাষায়:

'the struggle of the Republic ... seemed a struggle for the conditions without which the writing and reading of poetry are almost impossible in modern society.'[৭৫]

আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেমিংওয়েকেও স্পেনের গৃহযুদ্ধ নানাভাবে উৎসাহিত করেছে:

'It was a feeling of consecration to a duty toward all the oppressed of the world which would be difficult and embarrassing to speak about as religious experience and yet it was authentic ... It gave you a part in something that you could believe in wholly and completely and in which you felt an absolute brotherhood with the others who were engaged in it.'[৭৬]

ঔপন্যাসিক অ্যালবেয়ার কামুও স্পেনের ঘটনায় নিজের দায়কে বৃহৎ আকারে দেখেছেন। স্পেনে সংঘটিত একনায়কত্বের অত্যাচারবিষয়ে 'State of Siege' নামে যে নাটক লিখেছিলেন তার সমালোচনা করেন গ্যাব্রিয়েল মার্শাল। কামু মার্শাল-এর সমালোচনার যথার্থ উত্তর দেন একটি প্রবন্ধে যাতে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে নিছক একটি অভ্যন্তরীণ ঘটনাই নয়, তাকে অতিক্রম করে তা একটি প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে, সে-কথার নির্দ্বিধ উচ্চারণ করেন তিনি:

'For the first time men of my age came face to face with injustice triumphing in history.

গ্যাব্রিয়েলকে ভর্ৎসনা করে বলেন,

'You are not well informed, Gabriel Marcel. Just yesterday, five political opponents were condemned to death there. But you did everything you could to be ill informed by developing the art of forgetting. You have forgotten that the first weapons of totalitarian war were bathed in Spanish blood. You have forgotten that in 1936 a rebellions general, in the name of Christ, raised up an army of Moors, hurled them against the legally constituted government of the Spanish Republic, won victory for an unjust casse after massacres that can never be expiated, and initiated a frightful repression that has lasted ten years and is not yet over.'[৭৭]

প্রবন্ধের শেষে কাম্যু লেখকদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে সত্যসন্ধি উত্থাপন করেন, 'to bear witness and shout aloud, every time it is possible, insofar as our talent allows for those who are enslaved as we are.'[৭৮]

যদিও গৃহযুদ্ধ ঘটে যাওয়ার এক যুগ পরে (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) কাম্যু বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের তদানীন্তন মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন, তথাপি মনে হয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রতিবাদের সমকালীন আদর্শ।

কবিতাগুলিকে বস্তুত এই প্রেক্ষিতে অনুধাবন করলে মোটামুটিভাবে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের রকম ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনেক বোঝা যাবে এবং এ সম্পর্কে একটা সাধারণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিষয়ক কর্নফোর্ডের কবিতাগুলির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-বিশ্বাসের কোন পার্থক্য নেই, মার্কসবাদ তাঁর অধ্যয়নবিষয়, কমিউনিজম তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ, কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

'The past, a glacier, gripped the mountain wall,
And Time was inches, dark was all.
But here it scales the end of the range,
The dialectic's point of change,
Crashes in light and minutes to its fall.'

(Time Future)

অন্য একটি কবিতা---

'Though Communism was my waking time,
Always before the lights of home
Shone clear and steady and full in view -
Here, if you fall, there's help for you —
Now, with my Party, I stand quite alone.
Then let my private battle with my nerves,
The fear of pain whose pain survives,
The love that tears my by the roots
The loneliness that claws my guts,
Fuse in the welded front our fight preserves.'

(We knew him)

পূর্ব-প্রচলিত ধারণার চিহ্নিত ধ্বংস করে কবিতাগুলি সহজ সরল বর্ণনাধর্মিতার আশ্রয়ে একটি নতুন রূপ নির্মাণ করেছে। কবিতাগুলি উচ্চকণ্ঠ, মানবিক সংবেদনাই এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। তিন দশকের কবিতার সুরও একই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। স্পেনের কমিউনিস্ট নেত্রী ইবারুরি ডলোরেস এবং তাঁর বিখ্যাত স্লোগান 'নো পাসারন'-এর কথা মনে রেখে লেখা কবিতাটি---

'You are good, You have stood
Always in the vanguard, leading,

Hands held out to uphold
Children and women above this sea
of hatred and of blood.
You are wise. In your eyes
That smiled at me so lovingly
I saw and understood
Also the buried tears,
Crystallized toil and struggle,
Years of hardship, privation, sorrow.

(La Pasionaria)

এ ধরনের কবিতাকে বলা যেতে পারে 'হিরো-ওয়ার্শিপ' বা 'বীর পূজা'। অন্যদিকে তা আবেগে পাড়ু। ডলোরেস, ডলফস(অস্ট্রিয়ার নিহত চ্যান্সেলার), লেনিন প্রমুখদের নিয়ে যে অজস্র কবিতা লেখা হয়েছে এটি তার একটি। শেষে শান্তভাবে জানান---'তোমাকে দেখায় কমরেড ডলোরেস/কেননা, আমাদের সাথে সেখানে হবে জগতের নতুন নির্মাণ।' আদর্শের সঙ্গে নিজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের এ যেন আত্যন্তিকতা আজকের দিনে কবিতা-পাঠের গভীর তৃপ্তি দেবে না হয়ত, কিন্তু সাম্প্রতিকতার বিচারে তার মূল্য গড়ে উঠে ছিল বিশুদ্ধ মানবিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। হার্বার্ট রীড ও একই সুরে গলা মেলেছেন ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার মৃত্যুতে, র‍্যালফ ফক্সের 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড'র সৈনিক হিসেবে আত্ম-উৎসর্গে---

'Lorca was killed, singing,
and Fox who was my friend.
The rhythm returns : the song
which has no end.'

(The Heart Conscripted)

যে অন্তহীন সংগীতের সুর কবিদের বেদনাকে সংকল্প গাঢ়তা দিয়েছে ও প্রেরণা দিয়েছে তার মূল্য কেবল ঐতিহাসিক নয়, নয় কেবল মানবিকতায়, তার মূল্য আগামী সংগ্রামের উজ্জীবনে, আত্মিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মহত্তর অনুভবে---অন্তহীন সংগীত তাই জীবনকে ফিরিয়ে দিয়েছে এক বিশেষ ছন্দ, যে ছন্দ জীবনের মূল্যকেই দেয় তার বিপুল মর্যাদা। এদিক থেকে এই কবিতাগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

শুধু ইংরেজি ভাষার কাব্যে-কবিতায় বিশ্বপরিস্থিতির অনিবার্য পরিবর্তনের সূচনা করা হয় নি, এ কথা আগেই আমরা বলেছি। অন্যান্য ভাষার কবিতাতেও তার রীতিগত, বিষয়গত বিবিধ পরিবর্তন ধরা পড়েছে। চিলির কবি পাবলো নেরুদা(পুরো নাম--রিকার্দো এলিয়েজের নেফতালি রেয়েস বাসোয়ালতো)-র কবিতাতে ১৯৩৪খ্রীষ্টাব্দের পর একটি অনিবার্য পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই সময় তিনি চিলির কনসাল হয়ে স্পেনের বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে বসবাস করেন ও লোরকার মৃত্যুর পর(১৯৩৬)এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে কনসাল পদ হারান। স্পেনের জন্যে গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃঢ়তায় ঘোষিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতায়--

'One morning in a cold month,
in a dying month, stained with mud and smoke,
a month without knees, a sad month of siege and
misery,

... ...

Comrades,
then,
I have seen you,
and my eyes are until now full of pride
because I saw you through the foggy morning arrive
at the pure forehead of castille
silent and firm
like bells before the dawn,
full of solemnity and blue eyes coming from far away
and even farther,
coming from your corners, from your lost countries,
from your demands

full of burned sweetness and of guns
to defend the Spanish city in which entrapped
freedom
could fall and die eaten by beasts.

... ...

... you have made to be born again with your
sacrifice
the lost faith, the absent soul, the
confidence in the
land,
and by your abundance, by your nobleness, by
your
dead,
as through a valley of hard rocks of blood
passes an immense river with doves of steel
and hope.'

(Arrival In Madrid Of The International Brigade)

মাদ্রিদের কুয়াশাচ্ছন্ন বর্ণনা, মৃত্যুর নিস্তব্ধতা থেকে নগরীর তরুণের জাগরণ আর এর ভেতর প্রবেশ করে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাবাহিনীর বীরবিক্রমে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপক বর্ণনার মূল্য শুধু ঐতিহাসিকই নয়, যে-কোন মহৎ কবিতারই অন্যতম মূল্য যেমন তার কাব্যমূল্যে, এ কবিতার মূল্য সেই যথার্থ মূল্যেই প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য করবার, কবির আবেগ অতি-রোমন্থীন বক্তা ছাড়া, মনুষ্যের বেদনার ক্ষেত্রে ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে সেই আবেগই এতে রূপ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এরকম সার্থক দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

লাতিন আমেরিকার কবিদেরও স্পেনের ঘটনা নানাভাবে আলোড়িত করেছে। নিকোলাস গিয়েন-এর জাতিবী-আবেগও সমুচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মানুষের বেদনায়। 'দ্য ইবনিশ নিগ্রো' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে একদিকে মানুষের বিরক্তির কান্না, অন্যদিকে সংগ্রামের দৃপ্ত শপথ---

'Revolutionary Spanish people,

You are alone !

Alone !

Without or man and without a symbol.

Without a mystical emblem where sacrifice and

discipline

are crystallized.

...   .

I

believed one night that I was walking on mud,

and there

were human brains that for a long time were

stuck to the

soles of my shoes.

The 18th of November, only in one cellar of cadavers, I

counted three hundred dead children ...

(The Insignia)

যুদ্ধ বিষয়ক এই কবিতাটিতে লিয়ন ফেলিপের উজ্জ্বল স্লোগাননির্ভর হয়ে উঠেছে তার সরল বিবৃতিধর্মিতার জন্যে।

ফ্রান্সের আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে পল এলুয়ার আর লুই আরাগঁ দুজনেরই নাম প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। লুই আরাগঁ 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে' অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করেন। অন্যদিকে পল এলুয়ার নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। স্পেন এলুয়ারকে কী প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর স্পেন-সংক্রান্ত একাধিক কবিতা-রচনা দেখে। 'নভেম্বর ১৯৩৬', 'দ্য ভিক্টরি অব গোয়েরনিকা', 'ইন স্পেন' বা স্পেন' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর আন্তর্জাতীয় আবেগ বিপ্লবের শিবিরকেই প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে। প্রতীকী কবিতার ধারাকে অবলম্বন করেও যে বিপ্লবী-মননকে প্রকাশ করা যায় অনায়াসে, এলুয়ার তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর একটি কবিতা---

'If there is in Spain one tree stained with blood
It is the tree of liberty
If there is in Spain one talkative mouth
It talks of liberty
If there is in Spain one glass of pure wine
It is the people who will drink it.'

(In Spain)

এলুয়ার স্যুররিয়ালিজম থেকে কমিউনিজমের মতবাদে বিশ্বাসী হন। কিন্তু কোন কোন কবিতায় মতবাদের উগ্রতা প্রকাশ পেলেও (যেমন, 'নভেম্বর ১৯৩৬' কবিতাটি) তাঁর প্রতীকগুলিতে জ্বলে উঠেছে গণ-শান্তিবোধের আন্তর-তীব্রতা। একইভাবে স্যুররিয়ালিজম থেকে কমিউনিস্ট কার্যক্রমের অংশভাগী হন লুই আরাগঁ। আরাগঁ যুগপৎ রিপাব্লিকে উপন্যাস এবং ড্রামাতে--- তাঁর মাতৃভূমিকে, আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন--- তাঁর স্বদেশপ্রেম ব্যক্তি পায় 'লাইল্যাকস' বা 'গোলাপের' ভেতর দিয়ে এক নিবিড় ব্যঞ্জনাধর্মী সুর অনুভবে:

All is quiet here, the enemy rests in the night
And Paris has surrendered, so we have just heard —
I shall never forget the lilacs nor the roses
Nor those two loves whose loss we have, incurred;

('The Lilacs And The Roses', Tr. from french by Louis MacNeice.)

তুর্কি তাদের অন্যতম কবি নাজিম হিকমতও প্রগতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অজস্র সংগ্রামী কবিতা রচনা করেন। দেশের ঘটনা থেকে শারীরিকভাবে দূরে ছিলেন তিনি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন তাঁর উদ্দীপনা আর সেই দুরন্ত প্রাণসত্তার সুমধুর গাঢ় সমাচার অভিব্যক্ত হয়েছে 'ইট ইজ স্নোয়িং ইন দা নাইট' কবিতায়---

'It is snowing in the night,
You are at the door of Madrid.
In front of you an army
        killing the most beautiful things we own,
        hope, yearning, freedom and children,
                The city ...
It is snowing
And perhaps tonight
    Your wet feet are cold.
It is snowing
And while I am thinking about you
    a bullet might be hitting you right now;
    then for you no more
            snow, wind, day or night ...
It is snowing
Before you stood at the door of Madrid
        saying "no pasaran"
        you must have been living somewhere.

(It Is Snowning In The Night, Tr. from the Turkish by Ali Yunus)

সমস্ত রকমের দুঃখ-যন্ত্রণা-অত্যাচার সইতে হচ্ছে স্পেনের মানুষকে, সইতে হচ্ছে 'নন-ইনটারভেনশনে'র নীতির দুর্ভোগও, তবুও কবি দেখতে পান সংগ্রামী আর মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে অদ্ভুত আর সৌন্দর্য যা তাঁকে তীব্রভাবে আগামী দিনগুলির জন্যে এরূপ আশাবাদী করে তোলে।

উপরে যে কবিতাগুলির সাধারণ পরিচয় আমরা দিয়েছি তা এই আন্দোলনের সংস্পর্শজাত ও প্রেরণাসঞ্জাত ফসল। এগুলিকে সাধারণ নমুনা হিসেবে নিলে মোটামুটি বোঝা যাবে এর ভেতরকার মূল চারিত্র্যধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া আরও অজস্র কবিতা লেখা হয়েছে এবং অজস্র ভাষায়, এখানে তা অবান্তর। কারণ আমরা

শুধু বুঝে নিতে চেয়েছি কবিতাগুলি বিপ্লবের বা সংগ্রামের বর্ণনার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যগুলিতে কি কি ধরনের বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, কোন কোন কবিতায় আঙ্গিকবৈচিত্র্যের প্রতি কবিদের অতিনিবেশ দেখা গেলেও, প্রবল মানবিক আবেগের উচ্ছ্বাসে বক্তব্যই হয়ে ওঠে তার প্রধান গুণ। বিপ্লবের মূর্তিই বিষয়বস্তুর গৌরব এইসব ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তোলে। রাজনীতি ও সাহিত্য একাকার হয়ে যায়। মূল্য-বিচারে এসে পড়ে ঐতিহাসিকতার দায়, এসে পড়ে বিশুদ্ধ শিল্পের বিরুদ্ধবাদী এক বস্তুতন্ত্র মানদণ্ড। মূল্যবিচারে এখন শিল্পের দায় সামাজিক দায়। অত্যাচারিত ও সর্বহারা মানুষের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে চিরকালীন দায়, সেই দায়ই বস্তুত এইসব কবিতার মূল চরিত্রলক্ষণ। সেলডেন রোডম্যানের একটি মন্তব্য উদ্ধার করে এ প্রসঙ্গের এখানে শেষ করি: '... human and historical truth is better understood through art than through politics. If we are to understand what happens in the world, not merely intellectually, but also emotionally, poetry can help us reach a higher sense of reality. As the Mexican poet Octavio Pazhas said : there is no voice more faithful to a people than the voice of its poets.'[৭৯]

উল্লেখপঞ্জী

১। Marx, Karl and Frederick Engels : 'Preface To A Contribution To The Critique Of Political Economy' by Karl Marx, Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, pp. 503-04.

২। Lenin, V.I : On Literature And Art, Progress Publishers, Moscow, Third printing, 1975, p. 22

৩। Tse-Tung, Mao : Selected Writings, National Book Agency (Private) Limited, Calcutta, 1967, p. 303.

৪। Marx, Karl and Frederick Engels : 'Manifesto Of The Communist Party', Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, Fourth printing, 1977, p. 109

৫। Ibid, p. 112

৬। Thomson, David : World History (From 1914 to 1950), Oxford University Press, London, Reprinted, 1958, p. 56

৭। Lenin, V.I. : Collected Works, Vols. 32, Progress Publishers, Moscow, 1965, pp. 454-55

৮। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাক সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃঃ ৪

৯। Thomson, David : World History (From 1914 To 1950), Oxford University Press, London, Reprinted, 1958, pp. 114-15

১০। Elton, Prof. G.R., Edited : The Making Of The Second World War, George Allen & Unwin Limited, London, 1977, p. 34

১১। Lenin, V.I. : Collected Works, Vols. 32, Progress Publishers, Moscow, 1965, p. 453

১২। Ibid, pp. 454-55

১৩। বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে রচিত ও ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অনুদিত: স্বাধীনতা সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৭৭

১৪। তদেব।

১৫। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিত: শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), বর্ণালী বুক ক্লাব, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ ১০৭-০৮

১৬। ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে এই বিশেষ তারিখটি উল্লিখিত হল।

১৭। নরহরি কবিরাজ: স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃঃ ২১৫

১৮। সুশোভন সরকার: ইতিহাসের ধারা, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ: ১২৭

১৯। Gould, James A., Willis H. Truitt : 'Introduction : The Ideology of Fascism', Political Ideologies, The Macmillan Company, New York, 1973, p. 101.

২০। Ibid, 'The Doctrine of Fascism', p. 105

২১। Ibid, p. 106

২২। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিত: শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃ:২৪৮

২৩। Dutt, R.P. : Fascism And Social Revolution, National Book Agency Limited, Calcutta, 1st Indian Edition, 1946, pp.159-60

২৪। খালেদ চৌধুরী, অনুদিত: কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক: ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃ:৩২৯

২৫। তদেব, পৃ:৩৩০

২৬। তদেব, পৃ:৩৩৪

২৭। Dutt, R.P. : Fascism And Social Revolution, National Book Agency Limited, Calcutta, 1st Indian Edition, 1946, p. 155

২৮। Gould, James A., Willis H. Truitt : 'National Socialism : Twenty-five Points', Political Ideologies, The Macmillan Company, New York, 1973, p. 13.

২৯। Ibid, 'Man Must Kill', p. 118

৩০। ঋতায়ন, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৯ বৈশাখ, পৃ:৬২-৬৩।-(লাইপজিগে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ ডিমিট্রভের প্রদত্ত বক্তৃতার ঋতায়নে প্রকাশিত অনুবাদ)।

৩১। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিত: শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃ:২৩৮

৩২। Dimitrov, Georgi : United Front Of The Working Class Against Fascism (Report to the Seventh World Congress of the Communist International 1935 with Reply and Resolution), Culture Publishers, Calcutta, Reprint, 1969, p. 137

৩৩। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিত: শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃ:২৪৯

৩৪। দ্রষ্টব্য: রণধীর দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব ও ভারতে প্রয়োগের সমস্যা'।--ঋতায়ন, শারদীয়, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৯

৩৫। দ্রষ্টব্য 'ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি।--অনুষ্টুপ, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

৩৬। Laqueur, Walter, Edited : Fascism, Penguin Books, New York, 1979, p. 327

৩৭। Ibid, pp. 329-30

৩৮। Lenin, V.I. : Collected Works, Vols. 33, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 431

৩৯। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, [illegible] প্রকাশন, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃ: ১৩

৪০। তদেব

৪১। খালেদ চৌধুরী, অনূদিত: কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক: ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃ: ৩৩৩

৪২। তদেব, পৃ: ৩২৩

৪৩। তদেব, পৃ: ৩৬৬-৬৭

৪৪। জর্জি ডিমিট্রভের বক্তব্য আলোচ্য নিবন্ধের সমর্থনে দেখে। দ্রষ্টব্য:
-Dimitrov, Georgy : United Front Of The Working Class Against Fascism (Report to the Seventh World Congress of the Communist International 1935 with Reply and Resolution), Culture Publishers, Calcutta, Reprint, 1969, pp. 2-3

৪৫। Ibid, p. 2

৪৬। Ibid, p. 3

৪৭। Ibid, p. 6

৪৮। Ibid, p. 79

৪৯। Preston, Paul : The Coming Of The Spanish Civil War, The Macmillan Press Limited, London, 1978, pp. 190-92

৫০। Ibid, p. 191

৫১। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত: পরিচয় ('প্রতিরোধ প্রতিদিন'/ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ: ২০

৫২। Aronson, Alex and Krishna Kripalani, Edited : Rolland And Tagore, Visva-Bharati, Calcutta, 1945, pp. 20-22

৫৩। সরোজকুমার দত্ত, অনূদিত: শিল্পীর সংগ্রাম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), বর্ণালী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ: ৪৪

৫৪। The Modern Review, Vol. XL, No. 1-6, July-December, 1926, pp. 573-74

৫৫। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট') অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ৪৬

৫৬। The Modern Review, Vol. XLIV, No. 4, Whole No. 262, October, 1928, p. 373

৫৭। Ibid, Vol. L, No. 4, Whole No. 298, October, 1931, p. 482

৫৮। Ibid, Vol. LII, No. 2, Whole No. 308, August, 1932, p. 230

৫৯। Ibid,

৬৫। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ৫৯

৬১। খালেদ চৌধুরী, অনুদিতঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকঃ ঐতিহাসিক রূপরেখা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৮, পৃঃ৩৯০

৬২। তদেব, পৃঃ৩৯৩

৬৩। তদেব, পৃঃ৩৯৪

৬৪। Scott, H.G., Edited : Soviet Writers' Congress, 1934, Lawrence And Wishert, London, 1977, p. 277

৬৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সম্পাদিতঃ 'ব্যক্তি ও সমষ্টি' (অনুঃঅরুণ-কুমার মিত্র), প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৮

৬৬। তদেব, ইংলন্ডে স্বাধীনতা' (অনুঃআবু সয়ীদ আইয়ুব), পৃঃ৩৪

৬৭। The Modern Review, Vol. LIX, No. 3, Whole No. 351, March, 1936, pp. 346-47

৬৮। Ibid, Vol. LIX, No. 4, Whole No. 352, April, 1936, pp. 474-74

৬৯। Ibid, Vol. LX, No. 4, Whole No. 358, October, 1936, p. 488

৭০। Ibid, Vol. LXI, No. 1, Whole No. 361, January, 1937, p. 120

৭১। Ibid, p. 105

৭২। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আই উইল নট রেস্ট'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ৬৮

৭৩। Ford, Hugh D. : A Poet's War : British Poets And The Spanish Civil War, Oxford University Press, London, 1965, pp. 19-20

৯৪। Lehmann, John., Foreworded : Poems : From New Writing, John Lehmann, London, 1946, pp. 5-6

৯৫। Rosenthal, Marilyn : Poetry Of The Spanish Civil War, New York University Press, New York, 1975, p. 1

৯৬। Ibid, p. 4

৯৭। Camus, Albert : Why Spain (To See Resistance Rebellion and Death), London, 1961, pp. 58-9

৯৮। Ibid, p. 61

৯৯। Rosenthal, Marilyn : 'Preface', Poetry Of The Spanish Civil War, New York University Press, New York, 1975, p. X.

খ) প্রগতিশীল ঐতিহ্যঃ রবীন্দ্রনাথ

"চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ,
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।"
---রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে ওঠার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে প্রগতিশীল লেখক ও সাধারণ মানুষের এক অন্তহীন আগ্রহ আর কৌতূহল। এই আগ্রহ অহেতুক নয়। জমিদার পরিবারের এক খ্যাতনামা পুরুষ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির(১৯১৩খ্রীষ্টাব্দ) পর কিভাবে একটু একটু করে বিশ্বব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন, কিভাবে কালের সংকটে পড়ে যুগসমস্যার বিশ্লেষণে অতি-তৎপর হয়ে উঠলেন, এক অপ্রতিরোধ্য মত-নিরপেক্ষ বিশ্ববিশ্লেষণের পরাকাষ্ঠায় হয়ে উঠলেন আবিশ্বমানবের প্রতিনিধিপ্রধান--- মানবিকতার মহত্তর নিরিখে যার গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম, সে-বিচার প্রগতিশীলতার সন্ধানেও কোন অংশে কম নয়।

আমাদের দেশে ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রথম প্রগতি লেখক সংঘ তথা সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা। এঁদের সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর দিয়ে কয়েকটি লক্ষণ স্পষ্ট হতে চেয়েছিল(এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে 'পূর্বখন্ডে' খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে), তার প্রধান প্রধান কয়েকটি লক্ষণ এই আন্দোলনের বেশ আগেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক লক্ষণগুলির অন্যতম উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ তথা যুদ্ধবিরোধী যে বিশিষ্ট ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নানাবিধ রচনার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধকল্পে বা প্রতিবাদ-বাসনায় ব্রতী হন। এদিক থেকে তাঁকে প্রগতিশীল ঐতিহ্যের পথিকৃতের মর্যাদা দেবার যথাসঙ্গত কারণ রয়েছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বঘটনা থেকে একেবারে দূরে সরে থাকেন নি, দেশের ঘটনাও তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে

গেছে। যে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন অন্তর্মুখী, সেই রবীন্দ্রনাথই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, আবার আপাতজটিল কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধপর্বে জাপানে গিয়ে তাঁকে জাপানিদের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে হয়, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে শাসকপ্রদত্ত উপাধি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবার দুঃসাহসও প্রদর্শন করতে হয়। বিভিন্ন চিঠিপত্রে বিশেষ করে, 'বাতায়নিকের পত্রে' পাশ্চাত্য 'উন্নত পশ্চিমের সভ্যতার' জাতির সমসাময়িক দুর্নীতিযুক্ত রাজনীতির সমালোচনা এবং সেই সম্পর্কে কারণ অনুসন্ধানে সমগ্রপ্রয়াসী হতে হয়। এভাবেই তিনি চেষ্টা করেন আবর্তিত বিশ্বসংকটের মাঝখানে উপস্থিত হতে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রনাথ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষত যুক্ত ছিলেন না। তবে, তখনকার প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি কবির গভীর আস্থা (সংশয় সত্ত্বেও) ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, এই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা আত্মিকভাবে জড়িয়ে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই নিকট-মানুষ, কাজেই আন্দোলনের উপস্থিত ধারাগুলি সম্পর্কে তাঁর সম্যক একটা ধারণা যে ছিল না এমন কথা বলা সংগত নয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসম্পৃক্তির একটি আভাস আলোচ্য রচনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হবে।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ শুধু নয়, আমাদের দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে ওঠে নি। পরোক্ষ ধারণায় সর্বদা একটা অস্পষ্টতা থাকে। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম মহাযুদ্ধসংক্রান্ত ধারণা ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত ব্যাপার নয়, অনুভূতিশীল হৃদয়ের উপলব্ধ এক অন্তর্গত সত্য মাত্র। এর ব্যাখ্যা বস্তুসম্মতভাবে দেওয়া যায় না বলেই সম্ভবত রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা সি. এফ. এন্ড্রুজকে যেন মানসের বর্ণনা দিতে হয় এইভাবে: ...'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তখনো আমরা পাই নি। এমন-কি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা ছিলাম যে এ বিষয়ে সম্ভাব্য আলোচনা কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তাঁর মন সেই ঘনিয়ে-আসা দুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে।'[১] 'সর্বনেশে' কবিতাটি রবীন্দ্র-চিত্তের সংবেদনশীলতার তীব্রতা নিয়ে তাই অনেক আগেই প্রকাশ পায়।

কিন্তু লক্ষ্য করবার, প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মনোভাব আর যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিশেষজ্ঞসুলভ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দুটিই সমানমাত্রার হতে পারে না। বলা দরকার, প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র কবি-মন চূড়ান্ত অসংযমের ভেতরেও মনুষ্যসভ্যতার চিরকল্যাণকর একটি রূপের সন্ধানে ফিরেছে।

সে-রূপ কি শুধু কবিজনোচিত? একজন সংবেদনশীল মানুষের? তা নয়। রবীন্দ্রনাথের এই সংবেদনশীল সত্তার সঙ্গে মননধর্মেরও ঘটেছে এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ, ফলে এতদুভয়জাত বিশ্লেষণের ফলাফল আমাদের কাছে পেতে পারে এক অনস্বীকার্য গুরুত্ব। এদিক থেকে রবীন্দ্রমননের সঙ্গে প্রগতিশীল-মননচর্চার রয়েছে এক নিবিড় সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক।

১৯১৪খ্রীষ্টাব্দের ৪আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা জারী হলে পরদিন(৫আগষ্ট) কবি মন্দিরে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে---কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। ...'আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে, তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।'[২]...

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণে কোন ক্ষোভ প্রকাশ পায় নি। বরং মানুষের হয়ে মানুষের পীড়নের সুনির্দিষ্ট শাক্ত পরিণামের প্রতি কবিদ্রষ্টাসুলভ অস্তিবাদী মনোভাব ধরা পড়েছে। এই মনোভাবে বিশেষজ্ঞসুলভ বিশ্লেষণের পণ্ডিতজনোচিত প্রজ্ঞা নেই, রয়েছে সর্বত্র কবি-হৃদয়ের এক নিবিড় উত্তাপ।

যুদ্ধ-বেদনায় পীড়িত হয়ে একটি পত্রে লিখছেন কবি, 'দুঃখের মধ্য দিয়েই সব ঋণ শোধ করতে হবে, নইলে এই পৃথিবী আর এই জীবন যে ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।'[৩] (এন্ড্রুজকে লেখা পত্র, ১৬জুলাই, ১৯১৫)। রবীন্দ্রনাথ জীবনের জন্যেই জীবনকে ফের ফের মূল্য দিতে চেয়েছেন, নইলে, তিনি জানেন, মানুষ যদি একবার মূল্যহীনতার অভিশাপে জড়িয়ে যায়, তাহলে মনুষ্যসভ্যতারও কোন পরিণতি থাকবে না। আজীবন তিনি এই দিক থেকেই জীবন ও মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। এটা কোন অন্ধ উন্মাদনা অথবা বাস্তবকে অস্বীকারের মত সংঘটন নয়। তাই বারংবার তাঁর জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি মানুষেরই বিবেকের দ্বারে আবেদন করে ফিরেছে পৃথিবী-সংসার-সভ্যতাকে সাময়িক বিনষ্টির কবল থেকে মুক্ত করবার আগ্রহে। একটি পত্রে অহংদোষাক্রান্ত ইউরোপের বিবেককে জাগিয়ে তোলবার কী বিপুল আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে: 'বর্তমান সংগ্রামের উৎপত্তি কিসে থেকে, তা কি ইউরোপ কোনোদিন টের পাবে না? তার নিজ আদর্শই এককাল পৃথিবীর মধ্যে তাকে একটি মহৎ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই আদর্শের প্রতিই তার মনে সংশয় জেগেছে। এই সন্দেহটাই যে সংগ্রামের মূল কারণ, তা কি সে বোঝে নি? যে তেল দিয়ে সে নিজের প্রদীপটি জ্বেলেছিল, মনে হচ্ছে তা ফুরিয়ে গেছে। এখন সেই তেলের প্রতিও বোধ করি তার মনে একটা অবিশ্বাস জন্মেছে। ভাবছে, তার আলো জ্বালবার জন্যে কোনোদিনই এই তেলের প্রয়োজন ছিল না।'[৪] (এন্ড্রুজকে লেখা পত্র, ১১জুলাই, ১৯১৫)।

বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধকে প্রধানত দেখবার চেষ্টা করেছেন সংশ্লিষ্ট মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের প্রজ্ঞা আর বিবেকের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা। সে-আস্থা তিনি আজীবন লালন করেছেন। উক্ত পত্রে তারই স্বাক্ষর। অপর একটি পত্রে যুদ্ধকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন খানিকটা দার্শনিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে: 'শক্তি বলে একটা জিনিস যতদিন রয়েছে ততদিন আমরা বলতে পারি নে যে তার প্রয়োগ উচিত নয়। বরং বলতে পারি, এর অপপ্রয়োগ অনুচিত। প্রেমকে অস্বীকার করে শক্তিকেই যখন একমাত্র বলে জানি তখন এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাই থাকে বেশি। ......পরস্পর হানাহানি করাই যে যুদ্ধের একমাত্র রূপ তা যেন আমরা একবারও মনে না করি। মানুষ মূলতঃ নৈতিক জীব---তার অস্ত্রশস্ত্রও হবে নৈতিক।'[৫] (এন্ড্রুজকে লেখা পত্র, ৭ আগস্ট, ১৯১৫)। অহিংসাপন্থী রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকেই যেন বুঝতে পেরেছেন, নীতিগত কারণে কোন কোন সময় অস্ত্রপ্রয়োগ অনুচিত নয়। পশ্চিমী সভ্যতার ভেতরকার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে তিনি যথাসম্ভব বোঝবার চেষ্টা করেছেন। তারু শিংয়ের পত্রাবলীতে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে।[৬] 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটিতেও সেই প্রয়াস আরও স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বুঝতে বিলম্ব হয় নি, এই লড়াই বণিক-মানুষের লড়াই, লিখেছেন: ...'পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে---তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।
এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।
এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।...

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে---যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।
আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে।'[৭]

'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকে রবীন্দ্র-মানস অংশত বোঝা যায় না এমন নয়। বোঝা যায়, তিনি হিংসার বিরোধী, কিন্তু শক্তিচর্চার বিরোধী নন, যদি সেই শক্তি নৈতিক হয়, তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদবিরোধী কিন্তু দেশপ্রেম বিরোধী নন, বুয়র যুদ্ধের সময় রচিত নৈবেদ্যের কবিতা থেকে বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ-এর আগ্রাসী রূপ সম্পর্কে তিনি অনেক আগেই সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি যে ক্রমে ক্রমে বোধযুক্ত হয়েছে, সে পরিচয় তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও দিয়ে গেছেন।

একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ সম্পর্কেও তাঁর পুনঃপুন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে সার্বিক কলুষতার হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ব্রতী হন। প্রগতিশীল মননচর্চার এই ধারা তদানীন্তন প্রগতিশীল মানুষকে, লেখক-শিল্পী-ভাবুককে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে সংগ্রামী প্রচেষ্টায়, উন্মুখ করেছে উজ্জীবনের দিকে, সমস্তরকমের হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে উত্তরণের মন্ত্রণা দিয়েছে তাঁর বাণী। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের এই দিকটি মানবিকতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতম সংযোজন, বললে বেশি বলা হয় না সম্ভবত।

॥ ৩ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, সারা বিশ্বব্যাপী এক শ্রেণীর মানুষের তথা রাষ্ট্রের কুৎসিত কার্যকলাপ, লক্ষ্য করেছেন জার্মানির পরাজয়কে মূলধন করে শান্তি-বৈঠকের নামে দুনিয়াকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাগুলি কিভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। বোম্বেতে অনুষ্ঠিত এক সভায় (১৩এপ্রিল, ১৯২০) জনাব মহম্মদ আলী জিন্নার অনুরোধে প্রেরিত ভাষণে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দাই শুধু করলেন না, এর ভেতরে যে গত যুদ্ধের মূলাধার-বীজ রয়েছে তাও তিনি দেখেছেন, সেইসঙ্গে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে জানালেন: 'মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরো দুঃখভোগের জন্য। আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি (যুরোপের পীস্ কনফারেন্সে) শান্তি আলোচনার আবহাওয়াকে যেভাবে আজ কলুষিত করে তুলছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ভারসাম্য ফিরে আসতে লাগবে বহুদিন। জয়মদমত্ত শক্তিপুঞ্জের এই বৈরবীচক্রে কোনো স্থান নেই। তারা তাদের প্রতিজ্ঞায় বড়ো দুনিয়াটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। আমাদের যে-কথাটা জানা প্রয়োজন, সে হচ্ছে এই যে, যারা নিঃসহায়দের অপমান লাঞ্ছনা করে, নৈতিক অধঃপতন শুধু তাদেরই ঘটে না, যাদের উপর বর্ষিত হয় সে-অপমান, তাদেরও ঘটে সেই অধঃপতন। নিষ্ঠুর অবিচার যখন নিঃসন্দেহে জানে যে, সে পাবে নিশ্চিত অব্যাহতি, তখন তার কাপুরুষতা সত্যই কুৎসিত ও নীচ। কিন্তু এ অবস্থায়, দুর্বলের মনে যে ভয় ও নির্বীর্য ক্রোধের সঞ্চার-সম্ভাবনা রয়েছে, তা সেই কাপুরুষতার চেয়ে কম হেয় নয়। ...'ভ্রাতৃগণ, পশু-শক্তি যখন নিজের দম্ভবিশ্বাসে মানুষের আত্মাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করে, তখনই মানুষের সময় আসে, তার আত্মা যে অজেয়, সে-কথা জোর করে জাহির করবার। আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসা-গ্রহণের কুশ্রী সুর ঘোষণ ক'রে, আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না নৈতিক পরাজয়। সময় এসেছে, যখন যারা বিজিত, ন্যায়ের ক্ষেত্রে, তারাই হবে বিজয়ী।'[৮] এভাবেই রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন তাঁর নৈতিক অস্ত্র সম্বল করে সংগ্রামের ময়দানে। ঘোষণা করেন[৯] নৈতিক জয়ের কথা, বিশ্ববিশ্লেষণে তৎপর থেকেও তাঁকে বলতে হয় অহিংসার কথা, অথচ এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি, নৈতিক কারণে শক্তি প্রয়োগের উপযোগিতা তিনি স্বীকার করেছেন। সম্ভবত, তাঁর মতামত এরকমটা যে,'পশুশক্তি'র ভেতরে প্রতিহিংসার প্রবণতা থাকে, যা

অনৈতিক বলে তিনি মনে করেন, এই নৈতিকতার সঙ্গে ন্যায়বোধ, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতাও জুড়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের ক্ষেত্রটাকে আরও সুবিস্তৃত করে তুলতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সার্বিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁকে দেখি রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক প্রচারিত 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী'তে স্বাক্ষর দিতে। 'মানবতার দেবতা' ও 'স্বাধীনতার দেবতা'কে যে রোলাঁ একদিন বরণ করেছিলেন, লালন করে এসেছিলেন প্রাণের নিভৃতে,, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সেই ধারণা তাঁর পাল্টে যায়: 'বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যে কর্তব্য পালন করেন নাই, সাম্রাজ্যকে অবহেলা করিয়াছেন, স্বাধীনতার নামে স্বাধীন চিন্তাকে জনমতের কর্ণধারগণের দাসত্বপাশে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, তাহাদের দেওয়া সম্মান ও অর্থকে পরমোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ত' আমি যৌবনকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। যুদ্ধ ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। ইহারা যে কতখানি নিষ্ঠাহীন, চরিত্রহীন, দুর্বল সম্প্রদায়ের মত কতখানি স্বাতন্ত্র্যহীন যুদ্ধের কল্যাণে তাহা আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।'[৯] আর এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রোলাঁ এমন একটি 'সেনাবাহিনী' গড়ে তুলতে চাইলেন 'যাহারা সত্যের সার্বিক ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার আঘাতের হাত হইতে রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে'[১০], ১৯১৯খ্রীষ্টাব্দের ২৬জুন তারিখে 'হ্যুমানিতে' প্রকাশিত হয় তাঁর 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী' যাতে উচ্চারিত হয়েছে পূর্ণ মানবতার জয়গান: 'আমাদের কাছে জাতি এক, সে-জাতি অনন্য ও বিশ্বব্যাপী, সে-জাতির মানুষ দুঃখ ভোগ করে, লড়াই করে, বারংবার পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, রক্তসিক্ত কঠিন পথে অক্লান্ত চরণে আগাইয়া চলে। এ-জাতি সমস্ত মানুষের এক জাতি।'[১১] এই ঘোষণাবাণীতে অন্যান্যদের মত সাক্ষর দেন রবীন্দ্রনাথ, আর যাঁরা সাক্ষর দেন তাঁদের অন্যতম বার্ট্রান্ড রাসেল, গোর্কি, আপটন সিনক্লেয়ার, স্টেফান জোয়াইগ, হেরমান হেস, এলেন কে, কার্লো ফোরমিকি,, হাইনরিখ মান, বাঁডি বারবুস, সেলমা লাগেরলফ, আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীগণ। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'It is enough for me to know that the higher conscience of Europe had been able to assert itself in one of her choicest spirits through the urgly clamour of passionate politics; and I gladly hasten to accept your invitation to join the ranks of those free souls, who, in Europe, have conceived the project of a Declaration of Independence of thought.'[১২]

বোঝা যায়, রোলাঁর চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার একটা সাদৃশ্য এর দ্বারা ফুটে উঠেছে, এই বন্ধন পরে আরও গাঢ় হয়েছে নানা বিশ্বসমস্যার সামনে, বিশ্লেষণে, ব্যাখ্যায় এবং সংগ্রামে এই দুই মনীষী রয়েছেন আরও

নিবিড় নৈকট্য অনুভব করেছেন।

এর কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ আর একটি ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও ব্রিটেন---এই কয়েকটি দেশ নিয়ে আঁরি বারবুস, রোমাঁ, ফরেল, নিকোলাই প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে যুদ্ধ-বিরোধী সংঘ 'ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ক্লারাইট' বা সংক্ষেপে 'ক্লার্তে'। ১৫-দফার একটি ইশতেহার ফরাসির 'ইউমানিতে' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়, ১৯১৯খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ারে ভাষণদানকালে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এর উল্লেখ করেন।[13] বিশ্বের অশান্ত পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শুধু নয়, ক্ষমতাশীল ধনিকবর্গের রক্তশোষিতার বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার দমন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক আহ্বানই হল এর মূল সুর। কয়েকটি দাবি উল্লেখ করা যেতে পারে:

১। আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই ভুল। এই ব্যবস্থার পরিণাম স্বল্পসংখ্যকের সুবিধা, স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ন, ধ্বংস এবং হত্যা

৯। যে-কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতিই পরবর্তী যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। আঞ্চলিক সীমানা ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধগুলি উপর্যুপরি ভুল পথে নিয়ে চলে।

১৩। রক্তশোষীরা আসলে স্থিতাবস্থারই চাক বেটায়।

১৪। ধনতান্ত্রিকেরাই বিপ্লবের কারণ। বিপ্লবকে রক্তাক্ত করে তোলে প্রতিবিপ্লবীরা। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত তাঁরা নন, পক্ষান্তরে দমনকারীরাই যে-কোনো ধরনের যুদ্ধের জন্য দায়ী।'[14]

এখানে মাত্র চারটি দাবির কথা উল্লেখ করা হল। এই ইশতেহারে যাঁরা স্বাক্ষর দেন তাঁরা হলেন আঁরি বারবুস, আনাতোল ফ্রাঁস, এলেন কে, আন্দ্রিয়া লাতস্কো, এইচ. জি. ওয়েলস, ফরেল, রোমাঁ রোলাঁ, জেন অ্যাডামস, জর্জ ব্রান্ডেস, জর্জ বার্নার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিকোলাই, সেলমা লাগেরলফ।

ইশতেহারটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে এ কথা বলা যায় যে, যদি ঘটনার সত্যতা যথার্থ হয়, তবে বলতেই হবে, রবীন্দ্রনাথ এর দ্বারা শ্রমজীবী, সংগ্রামী সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি চলে এসেছেন, এবং 'শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য' 'শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধন' যে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান শর্ত, সেই শর্তকে তিনি অঙ্গীকার করেছেন।

এত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে ভুলতে পারেন নি, রোলাঁর দুশ্চিন্তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তার দৃষ্টান্ত পাই ৬ জুন, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রাসাদাদের দিনপঞ্জী' শীর্ষক কবিপুত্রের ডায়েরিতে। বিয়ার্সন, রোটেনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদিন আলোচনা হয়েছিল 'আধুনিক জগতে শিল্পী-সাহিত্যিক ও মনীষীদের কর্তব্য' সম্পর্কে। 'পরস্পর অপহরণে রত' রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সহযোগিতার পথে যত

ও অন্য দিকেও রোটেনস্টাইন অকুণ্ঠিত, রাষ্ট্রের আহ্বান যদি দেশ গড়ার পক্ষে আসে, তাহলে সেই আহ্বান উপেক্ষা করা শিল্পীদের অনুচিত। রবীন্দ্রনাথ বিপক্ষে মত রাখেন, বলেন, 'অন্যদের কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, অন্ততপক্ষে শিল্পীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন। শিল্পীকে বিধিনিষেধের নিগড়ে বেঁধে রাখা মানে শিল্পকেই কুণ্ঠিত করা।'[১৫] শিল্পীর স্বাধীনতার প্রবৃত্তি কোন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রিক অধীনতার কাছে কোনভাবে আত্মসমর্পণ করুক এটা রবীন্দ্রনাথ কখনও চান নি। অন্যদিকে রোমাঁ রোলাঁ স্বাধীনতার এই প্রবৃত্তিকে শেষ অবধি বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে সমর্থ হন।

১৯২১থেকে ১৯২৫খ্রীষ্টাব্দ অবধি বক্তৃতা, প্রবন্ধ বা অন্যবিধ রচনায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রবৃত্তির চাইতে বেশি করে ভেবেছেন 'পূর্ব ও পশ্চিমে'র মিলনের কথা। দুই সভ্যতার মিলনকল্পনার আবেগই এইসময় মুখ্য হয়ে উঠে ছিল তাঁর কাছে। চীন ও জাপান সফরকালে উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করবার পরামর্শ দেন তিনি, দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে দেশের লোকের কাছে সমালোচিত হন তিনি, তবু বিশ্বভারতীর বৃহত্তর আদর্শ থেকে সরে আসেন না [illegible], ১৯২১খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দেখে অনুভব করতে থাকেন 'পর ধ্বংসের বিকট নিঃশব্দ রূপ', বলেন, 'এ দৃশ্য আমার মনের সামনে এক উৎকটাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে এল, যার কোনো আকার নেই, অর্থ নেই, শুধু দুটি হাত আর বিবৃত মুখ-গহ্বর গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে আছে। আর আছে অতিস্ফীত মতলবময় মস্তিষ্ক। যেন একটি উদ্দেশ্য জীবন্ত শরীর পেয়েছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতা পায় নি।[১৬] এইরকম একটা সর্বশূন্যতার মধ্যে কবিকে ফিরতে হয়েছে দিনের পর দিন, তবু আস্থা না হারিয়ে তিনি সন্ধান করেছেন---'পাশ্চাত্ত্যজগতে অনেক এমন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি যাঁরা সেই দেবতারই সন্ধান করেন যিনি আমারও দেবতা'। এ দেবতা অধ্যাত্মলোকের নন, পূর্ণ মানবত্বের, অখণ্ডিত মনুষ্যত্বের। এ দেবতা বিশ্বমানব। শান্তিবিরোধী যুগেও তিনি এই পূর্ণ মানুষটিরই সন্ধান করে ফিরেছেন।

॥ ৪ ॥

এই সন্ধান দেশ এবং কালের সঙ্গে মিলিয়েও তিনি করেছেন। একদা ইউরোপের যুদ্ধের প্রদীপের শিখা থেকে ভারতবর্ষের প্রদীপের শিখা জ্বালিয়ে নিতে বলেছিলেন, এর মধ্য দিয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির, উদারনৈতিক মানসিকতার পরিচয় সহজেই মেলে। এমন প্রত্যাশা অকারণ ছিল না, কেননা, কেউ কেউ এসব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন ইউরোপে। এরকম ভাবনা শুরু হয়েছিল এমন সময় যখন কোন কোন দেশে রাষ্ট্রশক্তি বিপুল আধিপত্য অর্জন করে সার্বিক কল্যাণের নামে স্বৈরাচারকেই প্রশ্রয় দিয়ে পুষ্ট করে তুলছিল এবং যার বলি হচ্ছিলেন হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক, রক্তের অপরাধে প্রতিবাদহীন এইসব মানুষের কথা বিশ্ববাসীর কাছে যে-সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের তুলে ধরার কথা, তাঁরা ছিলেন নীরব, রাষ্ট্রশক্তির লোভের শিকার হওয়া ভীত ও দুর্বলচিত্ত। রবীন্দ্রনাথের কাছে

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয় ইটালি-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে, মুসোলিনির স্বৈরাচারী শাসনের সম্যক পরিচয় পেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে প্রথম পরিচিত[17] হন বন্ধুবর রোমাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যে এসে[18], এ কথা আজ অনেকেই জেনে নিয়েছেন। রোলাঁ লিখেছেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাঁহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাঁহার সংযোগসাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। যে-ফ্যাসিজম তখন তাঁহার নাম ভাঙাইতেছিল তাহার সহিত তিনি প্রকাশ্যভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।'[19] এই উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায়: ক) রোলাঁ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চোখ খোলার চেষ্টা করেছেন, খ) ফ্যাসিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা পাল্টে দিতে পেরেছেন, গ) শুধু ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে এমন নয়, ফ্যাসিজমের সঙ্গে সমস্তরকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াসকেও বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এবং এসবই রোলাঁর উদ্যোগে।

রোলাঁ আরও বলেছেন, এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ দলিল রয়েছে তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের কাছে। এই ঘটনার সময় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই। এর আগে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মুসোলিনির পরামর্শক্রমে(?) তাঁর আমন্ত্রণ বহন করে ও প্রচুর বইপত্র আর উপহার-সামগ্রী নিয়ে অধ্যাপক ফর্মিকি এবং অধ্যাপক তুচ্চি শান্তিনিকেতন আসেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ইটালিতে যেভাবে গৃহীত হন সে ঘটনা অনেকের কাছেই সুশোভন মনে হয় নি। এই সফরে রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী সঙ্গী ছিলেন বটে, তবে বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন। রোলাঁর মতে(নাকি মিসেস কার্পেলের মতে ?), বাবার প্রতি রথীন্দ্রনাথের প্রভাব কম বলেই এই সফরের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে তিনি আপত্তি জানাতে পারেন নি।

৩০মে থেকে ১৪জুন(১৯২৬) অবধি কবি ইটালিতে ছিলেন। ৩১মে মুসোলিনির সঙ্গে কবির নাটকীয় সাক্ষাৎকার ঘটে।[20] ২জুন তারিখে ফ্যাসিস্টদের মুখপত্র 'ত্রিবুনা'-র প্রতিনিধিকে বলেন যে, তাঁর রোমে আগমন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন যে, শেলি কীটস, ব্রাউনিং ও গেটের কাব্যের মধ্য দিয়ে দেখা দেশে তিনি এসেছেন, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। মুসোলিনি সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে, তাঁকে কিছু লিখে দিতে বলা হলে, কি ফ্যাসিস্ট-মতবাদসম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলে কবি যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।[21] এই সফরকালীন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাদি, ইটালিসম্পর্কিত প্রশংসাসূচক মন্তব্যাদি তখনকার কাগজে কাগজে মুখরিত হয়ে উঠে ছিল। সফরকালের শেষদিকে কবি সন্দিগ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কেননা, মুসোলিনির কাছে ইটালির দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে স্বয়ং মুসোলিনি

ও পর্বকালের সঙ্গী অধ্যাপক ফর্মিকি দুজনেই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন।[22] পরে জনৈক তরুণ ইটালিয়ান ক্যাপ্টেনের সাহায্যে ক্রোচের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ পান কবি। এ ব্যাপারে কয়েকটি তথ্য বিভ্রান্তিকর।[23] আরও বিভ্রান্তিকর এই দুই মনীষীর ভেতরকার কথাবার্তা। রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন যে, এই দুজনের মধ্যে কাব্য-সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে ইটালির জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে।[24] অর্থাৎ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয় নি। রোলাঁ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছ থেকে শুনেছেন, 'তিনি এসেছিলেন এবং তিনি মুখ বুঁজে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন শুধু আত্মসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু জানেন না।'[25] রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন মহলানবীশ-এর লেখা এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে প্রকাশিত রচনার ওপর।[26] ডিউক স্কোত্তিকে লেখা চিঠির একটি মন্তব্য সন্দেহ সৃষ্টি না করে পারে না---'স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা বীর, যাঁরা অকুতোভয়, তাঁদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ে আমার অনেক আনন্দ'[27] --কথাগুলি কি ক্রোচেকে মনে রেখেই বলা? যদি হয়, তবে অনুমান অসংগত নয় যে, যে-সাক্ষাৎকার 'ঘটিয়ে তুলতে' 'একটু বেগ পেতে হয়েছিল' তা বিশুদ্ধ কাব্যসাহিত্য বা আত্মসংক্রান্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, এই আলোচনা ইটালির সাম্প্রতিক রাজনীতিকেও আকর্ষণ করে থাকবে।

ফ্যাসিস্ট ইটালি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নানান তথ্য-প্রমাণ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও কবি প্রথম থেকেই তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। সম্ভবত সৌজন্যের তাড়নার জন্যেই এমনটা ঘটে থাকবে। সততার তাড়নাও কি কবি তাই বলে অনুভব করেন নি? ডিউক স্কোত্তি প্রথমবার মিলানে স্বাগত জানিয়েছিলেন কবিকে, তখন যে-ব্যবহার করেছিলেন, দ্বিতীয়বার তা করেন নি। পরে এক নিকট আত্মীয়াকে কিছু কাগজপত্রসহ মুসোলিনির অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত করতে পাঠান।[28] তাছাড়া বছর দুয়েক আগে ঘটে যাওয়া (১০ জুন, ১৯২৪) ইটালির ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক গিয়াকোমো মাত্তেওত্তি মুসোলিনির নিযুক্ত গুপ্ত আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান এবং এই ঘটনা ইউরোপে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, শুধু তাই নয়, রোলাঁ তাঁর মৃত্যুতে বন্ধু-বিয়োগের যন্ত্রণা অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সংবাদ শুনেছিলেন নিশ্চিত। তবুও তিনি মুসোলিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এবং স্বৈরাচারী এই নায়ককে 'নেপোলিয়ন' আখ্যায় ইতিহাস-কালের গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের মনে এঁদের চালচলন ও নিমন্ত্রণের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকতে পারে বলে অবন্তী সান্যাল মহাশয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[29] এই সফরে সঙ্গী হতে চেয়ে এনড্রুজও প্রতারিত হন। মাদলিন রোলাঁর (রোলাঁর বোন) কাছে এই ঘটনা শুনেছেন স্বয়ং রোলাঁ।[30] ইটালি ভ্রমণের পরে

তুরিনে অধ্যাপক সালভেমিনির স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ভাবে ইতালিতে আসার কারণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি এখানে এসেছেন ইতালির জনগণের ভালবাসার আমন্ত্রণে, এবং তিনি পূর্বপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। আরও বলেছেন, 'ভারতে থাকার সময়ে ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার বিবরণ মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম। তাই ইতালিতে ফিরে আসা সম্পর্কে আমার মনে গুরুতর আশঙ্কা ছিল। এই সময়ে অধ্যাপক ফর্মিকি শান্তিনিকেতন এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন মুসোলিনির কাছ থেকে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য চমৎকার উপহার---কিছু বই ও মুদ্রিত শিল্পকর্মের মূল্যবান একটি সংগ্রহ। তাছাড়াও আনলেন স্বয়ং মুসোলিনির কাছ থেকে প্রশংসাসূচক একটি চিঠি।...

'অধ্যাপক ফর্মিকি ও ডঃ তুচি আমাকে ইতালিতে আসার জন্য উৎসাহিত করলেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা দূরীভূত হয় নি এবং একসময়ে ইতালি সফর করার পরিকল্পনা কার্যত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে এসেছি তা রাখতেই হবে। তাছাড়া রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দেখা করার ও কিছু দিন কাটাবার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। মনে হয়েছিল এই হচ্ছে তার শেষ সুযোগ। তাই শেষপর্যন্ত ইতালিতে এসেছি এবং আমাকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'[৩১] কবির এই বক্তব্য সরলতাপূর্ণ, রোলাঁ যাকে 'শিশুসুলভ' বলে মনে করেন। লক্ষ্য করার, প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও জানিয়েছেন, এখানে আসার আগে কবি ইতস্তত করেছিলেন।[৩২] সেইসঙ্গে আরও লক্ষ্য করার, কবি ভিলেন্যভেতে এসে তিনদিন পর্যন্ত রোলাঁকে তাঁর সফরের কথা জানান নি। ২৪ জুন তারিখে এই প্রসঙ্গ ওঠে। কবি ফ্যাসিবাদের সমর্থনে তাত্ত্বিক বক্তৃতাই দিয়ে বসেন রোলাঁর কাছে: 'যদি কোনো জাতি প্রকৃতই নিজেকে চালাতে অক্ষম হয়, অরাজকতায় এবং নিষ্ফল হিংসায় যদি সেই জাতির তলিয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ স্বাধীনতাকে দমনকারী এক অনমনীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন তাকে মানতেই হয়।'[৩৩] অন্য একদিন রোলাঁ কবিকে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানান এবং ফ্যাসিবাদী স্বৈরশক্তির অবিচারের তথ্যগুলি তুলে ধরেন।[৩৪] কথাগুলি বলার পরেই রোলাঁ লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথের মুখখানা কুঁকড়ে গেল: কারণ তাঁর অসীম সংবেদনশীল মহৎস্বভাব সত্যিকারের যন্ত্রণা এবং মানুষের উপরে অনুষ্ঠিত দৌরাত্ম্য সহ্য করতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ কি এরপরেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মুখ ফিরিয়ে নেন? না, তা নয়। তখন তিনি অত্যন্ত মানসিক সংকটে পড়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন। কেননা, কবি ফ্যাসিবাদকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। আর এই সংবাদ মুসোলিনির প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ইউরোপে তথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে গেছে। 'আন্তর্জাতিক মৈত্রীভবনে'র কল্পনায় প্রবুদ্ধ রোলাঁ জর্জ দুহামেল ও রবিকেকে সঙ্গী করে এগোতে চেয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায়, পেতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকেও, অথচ কবি ওঁদের প্রস্তাবে, বিশেষত ইটালি ভ্রমণের পর, কিছুতেই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায়

থাকতে চান নি। দুহামেলের কাছে যখন ইন্টারভিউ দেবার প্রস্তাব হল রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ফিরিয়ে দিলেন। পরে লিখিতভাবে (৩০জুন, ১৯২৬) যে প্রতিবেদন পেশ করেন তা 'ইউরোপে ফ্যাসিবাদের দেবদূত' বলে গণ্য হওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তিত হন রোলাঁ ও দুহামেল।[৩৫]

এরপর তুরিন, ভিয়েনা ইত্যাদি শহরের বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান ইউরোপীয়দের সঙ্গে কবির ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই প্রচুর বিক্ষনীয় চিঠিপত্র পান। ভিয়েনা থেকে রোলাঁকে কবি লেখেন, 'ইতালিতে গিয়ে আমি যে পাপ করেছিলাম, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে।'[৩৬] এই সময় রোলাঁর 'ইয়োরোপ' পত্রিকায় ও ইউরোপের অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ অজস্র বিবৃতি ও রচনা প্রকাশ করেন ফ্যাসিবাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে। ৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' সি. এফ. এন্ড্রুজকে লেখা ফ্যাসিবাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার-করা চিঠিটি প্রকাশিত হয়, কবি বলেন: 'ইউরোপীয় দেশগুলির আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করার যোগ্যতা আমার নেই, ঝোঁকও নেই। এ-কারণে ইতালিতে এসে আমি চেয়েছিলাম আমার মনকে নিরপেক্ষ রাখতে।...

'ইতালিতে আমার যে-সব সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে তা তৈরি করেছে তিনজনের বাক্যবিন্দু---- রিপোর্টারের, দোভাষীর ও আমার।

'কিন্তু পরবর্তীকালে আমার বন্ধুরা যে-সব খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়েছে ও আমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছে তা পড়ে এই সমস্ত সাক্ষাৎকারে কী লেখা হয়েছিল তা জানার সুযোগ আমি পেয়েছি।...

'ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি ও নীতির সঙ্গে সমগ্র মানবতা সংশ্লিষ্ট, এবং এ এক উদ্ভট কল্পনা যে আমি কখনো এমন আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি যে-আন্দোলন কথা বলার স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে অবদমন করে, এমন কিছু পালনে বাধ্য করে যা ব্যক্তির বিবেকের বিরুদ্ধে, চলে হিংসা ও গোপন অপরাধের রক্তমাখা পথে। আমি এ কথা বারেবারেই বলেছি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসী চেতনা পশ্চিমের জাতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করছে তা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপদসঙ্কুল। ...

'সন্ত্রাসের দ্বারা নির্যাতিত হওয়াটা সহনীয়, কিন্তু মিথ্যা আদর্শের পূজায় প্রবঞ্চিত হওয়াটা সমগ্র যুগের পক্ষে অবমাননাকর, যে-যুগ ঘটনাক্রমে তার কাছে বশীভূত। ইতালি যদি বিশেষ এক রাজনীতির মাধ্যমে এমনকি সাময়িক লাভও অর্জন করে থাকে তাহলে এমন সৌভাগ্যের জন্য সে কথা পেতে পারে--- কিন্তু আমরা যারা বাইরের লোক, আমরা যারা আদর্শবাদে বিশ্বাস করি, আমাদের পক্ষে এমন অনুগত থাকতেই পারে না।[৩৭]...

কবিকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয়েছে আরও অনেকখানি বাঁক[৩৮] পেরিয়ে। এই চিঠি সম্পর্কে সমালোচক ঠিকই

বলেছেন: 'প্রকৃতপক্ষে এন্ড্রুজকে লেখা এই চিঠিতেই ফ্যাশিবাদসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।'[৩৯] এর আগে জুরিখ থেকে (৭ জুলাই, ১৯২৬) ফর্মিকিকে প্রথম চিঠি লেখেন ফ্যাশিবাদ প্রত্যাহার করে,[৪০] আর ২১ জুলাই, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে সরাসরি বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে ফ্যাশিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক আত্মহত্যা।'[৪১]

ফ্যাশিবাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের পর রবীন্দ্রনাথের ওপর ইটালির ফ্যাশিস্ট-সংবাদপত্রগুলি হিংস্রের মত জঘন্য আক্রমণ শুরু করে।[৪২]

ভারতবর্ষেও এই সময় ফ্যাশিবাদের প্রতি প্রবণতা মাথা চাড়া দেয়। রোলাঁর দৃষ্টি তা এড়ায় নি।[৪৩] ইতিমধ্যে ফ্যাশিবাদের ফাঁদ এড়াতে-না-এড়াতে, রোলাঁর সন্দেহ, রবীন্দ্রনাথ স্বজাতীয় ও বলকান ফ্যাশিবাদের কবলে গিয়ে পড়েছেন। সদুঃখে রোলাঁ বলেছেন, 'সমস্ত ইউরোপ সফর করার লোলুপ ও শিশুসুলভ বাসনায়, আর টাকা না-থাকায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার জন্যে এক ইম্প্রেসারিওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন।'[৪৪] যা সত্যিই বেদনাদায়ক তথাপি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ফ্যাশিবাদ সম্পর্কে এ এক অমূল্য অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তীকালেও কবিকে ফ্যাশিবিরোধী উজ্জ্বল ভূমিকায় স্থাপন করেছে।

॥ ৫ ॥

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ গানের জগতে প্রবেশ করেন, সাহিত্যে ফ্যাশিবিরোধিতার তেমন নমুনা চোখে পড়ে না। আমেরিকা ভ্রমণের পরে লেখা 'রক্তকরবী'তে ধনবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণযন্ত্রণার ছাপ পড়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করার, এখানেও মানবমুক্তির চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে, আর এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তো মানবপ্রগতির গভীর বিশ্বাসজনিত অনুভূতিই বটে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিলে 'দ্য ওরিয়েন্টাল প্রেস' পত্রিকায় 'চীন, ভারত ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে[৪৫], অথবা ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট এম্পায়ার থিয়েটার হলে 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে,[৪৬] অথবা রোলাঁ ও আঁরি বারবুসের 'একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমিতি' গঠনের ভাবনার অংশীদার হয়ে বারবুসের প্রেরিত 'মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদনে'র প্রতি সমর্থন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে বিশ্ব-রাজনীতির খুব কাছাকাছি এসে পড়েন। তিনি বারবুসের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে লেখেন: 'বলা নিষ্প্রয়োজন যে আপনার আবেদনে আমার সহানুভূতি আছে এবং আমি নিশ্চিত যে সভ্যতার গভীর থেকে হিংসার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশে যাঁরা আতঙ্কিত সেই অজস্র মানুষের কণ্ঠ এই আবেদনে প্রকাশ পেয়েছে।

...'সংস্কৃতিবান মানুষদের মধ্যে যখন অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় তখন প্রমাণিত হয় বার্ধক্যের দ্বিতীয় শৈশব, মানব প্রবৃত্তির কাছে যে বার্ধক্য তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তার লোভের মূলে থাকে আবেগপ্রবণ তারুণ্য

নয়, শুধু রক্তের নির্বিবেকী নিরেট বার্তা!'[৩৭]... রবীন্দ্রনাথের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকা মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেন। পত্রের শেষে কবি মাহমুদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর আন্তর্জাতিক সমালোচনামূলক পত্রিকা 'ধিঁদ'-এ মাঝে মাঝে লেখা দেবেন বলে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বশান্তিকামী লীগ বা 'ওয়ার্ল্ড-লীগ ফর পীস'-এর পক্ষে ওর্ফি দেভিয়ান রোমাঁ রোলাঁর মাধ্যমে কবির কাছে একটি চিঠি পাঠান, 'দ্য গোল্ডেন বুক অব পীস' নামক একটি স্মারক গ্রন্থে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বাণী সংকলনের উদ্দেশে।[৩৮] সংযুক্ত্রিত ভেনায়-পত্রের ওপর কবি ইংরেজি ও বাংলায় সই করে দেন, এবং বলেন, বর্তমানের রাজনৈতিক যজ্ঞে নিজেদের হাতে তৈরি উপজাতীয় দেবতার পূজা কিভাবে মানুষের রক্ত দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। মাহমুদকে লেখা পত্রেও কবি একইরকম ভাবাবলি ব্যবহার করেছেন। কবি বলেন, 'এই বিকৃত পূজা আদিম বন্যতার পরিচায়ক, এবং ইহা সেই তত্ত্বকে সূচিত করে, সংক্রামনীল মৃত্যুর মতো যাহার গতি। আমাদের অনেকের কাছে এই রক্তমত্ত পৌত্তলিকতা মানবচরিত্রের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা জানি, অতীত ইতিহাসে বর্ণিত্রক অবুদ্ধিসঞ্জাত ভয়ের মরীচিকা ও সন্দেহের বিভীষিকায় বহু ঘটনার জন্ম হইয়াছে।'[৩৯] রাজনীতির আত্মঘাতী উন্মত্ততার দিন-এর অবসান ঘোষণায় কবি নির্দ্বিধ, 'Let us, to-day, by the strength of our own faith prove that the homicidal orgies of a cannibalistic politics are doomed, in spite of contradictions that seem overwhelmingly formidable.'[৪০]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কবির সঙ্গে জনৈক কোরীয় যুবকের শ্রেণীগত সংগ্রামের সমস্যাবিষয়ে এক আলোচনা হয়। সারা বিশ্বজুড়ে শাসক ও শাসিতের, শোষক ও শোষিতের, ধনিক ও শ্রমজীবীর শ্রেণীসংঘাত প্রাক্, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপর্বে যেভাবে ধনিয়ে উঠছিল, যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এর তীব্রতা, এই অন্যায় ও জরুরি সমস্যার দিকেও রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিতে ভোলেন নি। পরাধীন জাতির অন্তঃসঞ্চিত বেদনা ও বিদ্রোহ নিয়ে কোরীয় যুবকটি আলোচনায় অংশ নেন, তাঁর মতে, জাপানি রাজন্য ধনিকের, কোরিয়া তার উপনিবেশ, তার ধন-শোষণের ক্ষেত্র। এতে জাতীয় গৌরব বাড়ে না। কবি বলেন, এই আত্মগৌরবের মূলে জাপানি শিক্ষা। যদি এই শিক্ষার দ্বারা মুক্তিদেয় মানুষ জাগ্রত হয়, ক্ষমতা দখল করে, তবে সেই ক্ষমতা মুক্তিদেয় মানুষেরই করায়ত্ত হবে, জনসাধারণ বঞ্চিত থাকবে। কোরীয় যুবকের মতে, সর্বহারাশ্রেণী দুঃখের ঠেকে শিখবে, ধনিকেরা তা পারবে না। রবীন্দ্রনাথ সন্দেহাতুর স্বরায় বলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত উচ্চবৃদ্ধি অত্যুক্তি আঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেইদিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না? সমত্ব এবং সমত্ত্ব কি একই কথা নয়? ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের

মধ্যে কল্যাণ-সমুদ্র-স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার ব্যবধানের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে।'[৫১] রবীন্দ্রনাথ ভেদও চান, কল্যাণও চান, কীভাবে তা সম্ভব এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে স্বৈরাচারের আতঙ্ক এবং এর প্রতিক্রিয়া যে হিংসাপ্রবৃত্তির জন্ম এটাই কবিকে এমন সমালোচনায় উন্মুখ করে থাকবে। অন্যদিকে রোমাঁ, যিনি নিজেও উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে হিংসাকে অবলম্বন করতে চান না,[৫২] তিনিও হিংসার সাধনে তরুণদের 'খ্রীষ্টের বাণী অনুসরণ' করার পরামর্শ দিতে বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন।[৫৩] কোরীয় যুবকের সমস্যা যে-কোন পরাধীন জাতির অথবা ঔপনিবেশিক দেশের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বজনীন সমস্যা থেকে চোখ যেমন ফিরিয়ে নেন নি, তেমনি একটা দ্বিধার মধ্যেও যে ছিলেন এটা বোঝা যায়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া ভ্রমণে যান কবি। এই তীর্থদর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেক বাধা।[৫৪] কবি লক্ষ্য করলেন, 'বসুন্ধরাব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।'[৫৫] এর আগে কোরীয় যুবকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্ন নিয়ে। তাতে কবির দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নে, বিপ্লবী হিংসাতত্ত্বের প্রায়োগিকতার প্রশ্নে। অবশ্য এর বিরুদ্ধ যুক্তিও তেমন শক্তিশালী ছিল না কবির কাছে, তাঁর লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না ধন-বৈষম্য তথা শ্রেণী-অসাম্যের প্রবৃত্তি---ধনী আর নির্ধন এই 'দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।'[৫৬] সোভিয়েট যুবনীতিপ্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা: ...'অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট যুবনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে---ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি।'[৫৭] সোভিয়েট লেখকদের সংযুক্ত ফেডারেশনের এক সংবর্ধনা সভায় কবি আরও প্রশংসার সঙ্গে বলেন----'একটি জিনিস আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, আপনারা সবার প্রতি শিল্পের অমূল্য অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এর ফলে মানব-মনে যত অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে, আর এটা এতই বড়ো জিনিস যে তাতে গর্ববোধ করার আপনারা অধিকারী।'[৫৮] পাইওনিয়ার কমিউনের পাইওনিয়ারদের উদ্দেশে আবার: 'আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই স্বাধীনতা, যার মধ্যে পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পায় মানুষের দুটি গভীর প্রেরণা---মানব-প্রেম ও সমাজ সেবা।'[৫৯] কবি জানতে চান, তরুণ যুব পাইওনিয়াররা এই স্বাধীনতাকে কীভাবে অভিব্যক্তি দিচ্ছে। রাশিয়ার কৃষিভবন ও তাঁর নিজের চিত্রপ্রদর্শনীতে বহুলোক দেখে কবি আন্তরিকভাবেই খুশি হন। কবির চোখে

এটাও চোখে পড়েছে, কিছুদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন 'লীগ অব নেশনসে' অন্তর্বর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। সব মিলিয়েই রাশিয়ার উন্নত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কবি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, ফলে প্রায় বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে---'বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা।'[10] আরও পরবর্তীকালে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, 'মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি।'[11]

১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে কবি আমেরিকাতেও ভ্রমণ করেন এবং নিজেকে প্রগতিশীল মানবের ভূমিকায় এখানেও তুলে ধরেন। ইউরোপে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে জেনেভাতে 'জয়েন্ট পীস কাউন্সিল' নামক একটি সংস্থা আন্দোলন শুরু করে এবং তাঁদের একটি ঘোষণাপত্র[12] প্রকাশ করে যাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, বিশপ অব বার্মিংহাম, জন ডিউই, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, টমাস মান, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারটিও উল্লেখযোগ্য নানা কারণে। নিউ হিস্ট্রি সোসাইটির উদ্যোগে রীজ কার্লটন হোটেলে এই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ ও শান্তি সমস্যা নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ তীব্র বক্তৃতা দেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দ্য লিটারারি ডাইজেস্ট'-এ (৩জানুয়ারী, ১৯৩১) এই দুই মনীষীর ছবি ছাপা হয় শান্তির প্রচার উপলক্ষে।[13] যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই প্রচারাভিযান ক্রমে ব্যাপক ও অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠছিল আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতির জন্যে।

১৯৩২খ্রীষ্টাব্দে কবি পারস্য যাত্রা করেন। একাধিকবার বিদেশ সফরের ফলে কবির দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র রূপান্তরের আস্বাদ অনুভব করে। মানবমৈত্রীর বোধ তার ফলে দীপ্তিশীল ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বোগদাদে সেখানকার কবি ও সাহিত্যিকদের সংবর্ধনার উত্তরে সেই মনোভাবই প্রকাশ পায়:'প্রবল জাতির লোলুপতা দুর্বল জাতিকে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, অন্যায়কুশাগ্রবুদ্ধির জন্য দুর্বল জাতিকে শোষণ করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাই আজ মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সন্দেহে দুঃখে যন্ত্রণাজর্জরিত। ...মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রী-স্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাঁথতে হবে।'[14]

১জুন, ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় আমস্টারডামে এক বিশাল শান্তিসম্মেলন। উদ্যোক্তা ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ, বারবুস প্রমুখ। ২৭ ও ২৮আগস্ট (১৯৩২)-এ ঐখানেই অনুষ্ঠিত হয় 'যুদ্ধ-বিরোধী কংগ্রেস'। এই বিরাট সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ কোন বাণী প্রেরণ করে থাকতে পারেন বলে অনুমান করেছেন অধ্যাপক নেপাল মজুমদার। তিনি লক্ষ্য করেছেন 'সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁহার নাম ছিল।'[15]

পৃথিবীতে যুদ্ধ-পরিস্থিতি যখন ঘনিয়ে উঠছে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের(১৯৩২)ব্যর্থতার পর, হিটলার যখন

সংস্কৃতি-জগতে আঘাত হানার জন্যে উদ্যত, দেশের ভেতরেও যখন একের পর এক অবিচারের রক্তস্রোত (জিরলি হত্যাকান্ড, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অবমাননাকর পুনাচুক্তি, বর্ণহিন্দু কর্তৃক হরিজন-নিধন ইত্যাদি) বয়ে যেতে থাকে, তখনকার সেই মহিমান প্রেক্ষিতে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'কালান্তর' প্রবন্ধটি (১৩৪০, শ্রাবণ) পাঠ করলে বোঝা যাবে কবির মর্মমূলে কেন বিক্ষোভ জাগে অবিচার আর ব্যভিচারের ইতিহাস সংরক্ত আবেগের সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে। কবির গভীর বিশ্বাস ছিল ইংরেজ জাতির ওপর, কেননা, যথার্থ সভ্যতার আলো তারাই ইউরোপীয়দের দান করেছিল, সেই দান বিশ্বের প্রান্তেও বিস্তৃত হয়েছিল। অথচ তারাই এশিয়া, আফ্রিকা আর আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় ঔপনিবেশিক শাসনের কদর্য রূপটিকে অত্যন্ত বীভৎসভাবে ব্যবহার করেছে। কবির বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে উঠেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে-পরেই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কবি বলেন, 'য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা? ...যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবল ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব, এই যুগ মানব শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।'[৬৬] রবীন্দ্রনাথের গলায় কি এই পর্বে হতাশার সুর? নইলে বিশ্বাসের প্রশ্ন তুলবেন কেন তিনি? রোমাঁ রোলাঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানবিক সমস্যাগুলি নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করেন নি, তিনি ছিলেন তুলনাহীন এক কর্মতৎপর মানুষ, তাঁর মত সক্রিয় কর্মীর নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না, তথাপি কবি হতাশাকে ততটা আমল না দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির বর্বরনীতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিবাদ করে গেছেন ব্যক্তিগত সংগ্রামের সীমানায়। দেশে-বিদেশে মানুষের বিচিত্র সমস্যায়, জয়ে-পরাজয়ে যে কবি একাত্ম, তাঁকে 'গজদন্তমিনারবাসী' কবি বলে উপেক্ষা করতে চান নি রবীন্দ্র-সমালোচকদের কেউ কেউ।[৬৭] আমরাও এই অভিমত স্বীকার করি।

ভারতবর্ষে এই সময় বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হিটলার ও মুসোলিনি-চর্চা চলছিল। 'ইন্ডিয়ান ডেইলি মেল' (জানুয়ারী, ১৯২৭) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে মুসোলিনির ছবি ছাপা হলে এর প্রেরক এইচ. মারিভিকে রোমাঁ লেখেন (১৫ জানুয়ারী, ১৯২৭): ...'আমি আপনাকে জানাতে চাই, এই সংখ্যায় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের পবিত্র মুখচ্ছবির পাশে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারী মুসোলিনির ছবি দেখতে পেয়ে কতখানি ধাক্কা খেয়েছি। ইউরোপের মুক্ত মনে এ যে কী আতঙ্ক জাগায় তা আপনি জানেন না।'[৬৮] রবীন্দ্রনাথ এ খবর জেনেছিলেন কি না, তা জানা যায় নি, তবে সঙ্গতভাবে অনুমান করা চলে যে, মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপা

হওয়ায় তাঁর গৌরবান্বিত হওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। তিনি ফ্যাসিবাদকে যেমনই নিন্দা করেছেন, নিন্দা করেছেন সাম্রাজ্যবাদেরও। যে প্রগতিশীল আদর্শবাদ তাঁকে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল এসবের নিন্দা-সমালোচনায়, সেই আদর্শবাদ থেকে তিনি কখনও সরে আসেন নি। ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'ইজরাইলস মেসেঞ্জার'-এর সম্পাদক এন. ই. বি. এজরাকে ইহুদি-নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'খোলা চিঠি' দিয়ে তার প্রতিবাদ করেন।[৬৯] জাতি-বৈরিতাকে সর্বপ্রকারে ঘৃণা করে এসেছেন কবি। ইংল্যান্ডের অধ্যাপক গিলবার্ট মারেও জাতিতে জাতিতে হিংসা-বিদ্বেষের বিরোধী ছিলেন, তাঁর ও কবির দুটি পত্র 'লীগ অব নেশনসে'র অন্তর্গত 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন' নামক সংস্থা ১৯৩৩খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। কবি উক্ত পত্রে বলেন, আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।[৭০] ইউরোপের 'পাপাচার' ও অপরাধের নিন্দা করেন তিনি। ইতিপূর্বেও একাধিকবার তা করেছেন।

বাস্তবিকপক্ষে সংঘ-সাফল্যে বা ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততা রোধ করা সম্ভব হয় নি, তবু কবিদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যযুগের সেতুবন্ধনপ্রয়াসকে, বিবেকী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জাগরণকে ও ফ্যাসি-বিরোধী গণচেতনাকে প্রগতির সংশ্লিষ্ট উপাদান হিসেবেই দেখা দরকার। আর এই চেতনার প্রকৃষ্ট ধারক যে রবীন্দ্রনাথই, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

॥ ৬ ॥

৬ জানুয়ারী, ১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে কবি সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কবির মতামত স্পষ্ট, নির্দ্বিধ: ...'বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির সর্বস্ব নিঃশেষ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল।......এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনবে না।'[৭১] স্পষ্টত এই ইঙ্গিত 'লীগ অব নেশনসে'র ব্যর্থ শান্তি-প্রচেষ্টারও। ৭ মার্চ, ১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দে কবি স্পষ্ট করে বললেন, 'ইংরেজ মানব ইতিহাসে সেযুগে যে পাপ করেছে সে হচ্ছে চীনের মতো অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঠেসে দিয়ে। নিজের উদরপূরণের জন্যে এত বড়ো নরঘাতি দস্যু সভ্য-বর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।'[৭২] সাম্রাজ্যবাদের এই চরিত্রটি কবি ভাল করে চিনেছেন রাজনীতিবেত্তার প্রজ্ঞায়। আরও গভীরতর সত্য তিনি বুঝেছেন, ইংরেজের শিথিলমুঠি থেকে ভারতবর্ষ একদিন খসে পড়বেই, সেদিনও রয়ে

ধারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্র প্রতিক্রিয়া। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার এই বহুদন্তী রূপ, শোষণের ভয়াল রূপ-ব্যাদান কবি আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি দিবসে প্যারিসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। অঁরি বারবুসের আবেদনপত্রটি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। উক্ত শান্তি-কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয় উদ্যোগ কমিটি(বা 'ন্যাশনাল ইনিসিয়েটিভ কমিটি অব দ্য ওয়ার্ল্ড পীস কংগ্রেস') এই সময় গঠিত হয় এবং এতে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর সাংগঠনিক সম্পাদক। সম্মেলনের তারিখ বারবুসের মৃত্যুর কারণে(মৃত্যু:৩০আগস্ট, ১৯৩৫) পিছিয়ে দেওয়া হয়।[৭৩]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২অক্টোবরে মুসোলিনি কর্তৃক আক্রান্ত হয় স্বাধীন রাষ্ট্র আবিসিনিয়া। এই আকস্মিক আক্রমণে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা সরাসরি একটি বিপদের মুখোমুখি হয়। 'লীগ অব নেশনস' ইটালিকে আক্রমণকারী বললেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অক্ষম। কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখেন: 'দিশি এমন একটি কাগজও নেই যাতে আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ প্রকাশ করে নি। রাষ্ট্রনৈতিক শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই যে এটা করা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে বর্ণবিদ্বেষমূলক উত্তেজনা আছে।...'প্রবলের বাহুবল প্রয়োগের যুদ্ধরূপটা আমাদের কাছে স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। তা নিয়ে কোন প্রকারের তর্ক তুলতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু যুদ্ধের চেয়ে দারুণতর অভিঘাত আছে তার লাল রংটা চোখে পড়ে না বলে সে সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল দরদ জাগাবার সম্ভাবনা নেই। তারই সাংঘাতিকতা দুর্বল জাতির পক্ষে সবচেয়ে অপরিমিত।'[৭৪]
অসহায় দুর্বল মানুষের ক্ষীণচেষ্টার মত রবীন্দ্রনাথ তারও প্রতিবাদ করেছেন---বলেছেন, 'তার বিরুদ্ধে কণ্ঠ-চালনা করে সান্ত্বনাচেষ্টারও অন্ত নেই। সেই ক্ষীণ কলরবের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি নিজের কানে ফিরে এসে আমাদের পরিহাস করে।'[৭৫] তবুও এই পথে 'সুর সাধনা' করতে ছাড়েন নি কবি।

এদেশে 'সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘে'র সূচনা ১০এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয় ১১জুলাই, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘে'র উদ্যোগে গোর্কির স্মৃতি-সভায় কবি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন: 'ম্যাক্সিম গোর্কি স্বীয় মানবপ্রেম ও সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।'[৭৬] এর আগে পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী'তে গোর্কিরচিত টলস্টয়ের জীবনী পাঠ করে কবি তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন।[৭৭] ২১জুলাই, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে জওহরলাল নেহরু কবিকে 'ভারতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘে'র সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন।[৭৮] উক্ত সংঘের সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয় ৩১

জন সদস্য নিয়ে, সুশোভনকান্তি বসুর সভাপতিত্বে ২৬ জুলাই, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের গঠনতন্ত্র রচিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতা কী নির্দয়তায় দমন করে চলেছিল তার অজস্র তথ্য দিয়ে রোলাঁর ভাষ্য ছিলো।[৭৯] ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সম্মেলন শুরু হয়। ভারতের প্রগতি লেখক সংঘের বিশেষ উদ্যোগে এই সম্মেলনে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয় যাতে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেন। উক্ত আবেদনে ব্রিটিশ-ভারতে নাগরিক অধিকার থেকে কিভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কি করে সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হানা হচ্ছে, শুল্ক আইনের ১৭৫ ধারার সাহায্যে বিদেশ থেকে পাঠানো পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকা আটক করা হচ্ছে, সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের 'সোভিয়েট কমিউনিজম', রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদ সরকারী কুনজরবাজির শিকার হয়েছে---এইসব বিস্তারিত তথ্য তাতে উল্লেখ করা হয়। আবেদনে আরও বলা হয়: 'সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরী শাসনের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জাতিবাদী রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। ...আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। ...সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসী জার্মানীই হউক---যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।'[৮০] এতে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, প্রেমচাঁদ, জওহরলাল নেহরু, প্রভৃতি। তারিখ ১৪ই ভাদ্র ১৩৪৩।

এই বিশ্বসম্মেলনে কবি স্বতন্ত্রভাবে বাণী পাঠান। শান্তিকামী কবি পরিষ্কার বলেন, যুদ্ধ-নিবৃত্তির অর্থ নিছক শান্তি নয়, 'দুর্বলজনের ক্লান্তি'র ওপরে নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় 'ন্যায়পরায়ণের শক্তি'র ওপরে। বলেন, 'আবিসিনিয়ার শান্তির আর্তনাদ স্পেনের যুদ্ধের কোলাহল হইতে কম বীভৎস নহে। কাজেই যে শান্তিতে এক জাতির পদতলে অপর জাতির মধ্যে পরিতৃপ্তি ফুটিয়া উঠে না, সেই শান্তি যদি আমাদের কাম্য হয়,---তাহা হইলে, যুগে শান্তির কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামলুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগবাঁটোয়ারায় ব্যাপৃত হওয়ার মত নিন্দনীয় অবস্থা হইতে সমৃদ্ধ জাতিগুলির প্রত্যেক নাগরিককেই আজ মুক্ত হইতে হইবে।'[৮১] ব্রাসেলসের শান্তি সম্মেলনে লেখক সংঘের উদ্যোগে যে ইস্তেহার প্রেরিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ-এর নিজস্ব বাণী

ছিল তারই পরিপূরক। ব্যক্তিগত বাণীতে তিনি স্পেনের প্রসঙ্গ টেনে এনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে সঠিক পদক্ষেপ নেন, কেননা, ইস্তেহারে স্পেনের প্রসঙ্গকে উল্লেখ করা হয় নি। বস্তুত এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মহিলাদের আন্তর্জাতিক সংস্থা'র শান্তি-উদ্যোগে বাণী প্রেরণ করে,(৩সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬), ৫-৭সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারিসে পি. ই. এন. কংগ্রেসের চতুর্দশতম বার্ষিক সম্মেলন-এ ব্যক্তিগত বাণী পাঠিয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের তীব্র বিরোধিতাকে নৈতিক সমর্থন জুগিয়ে যেতে থাকেন।[৮২] কলকাতায় ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার' নামে যে সর্বভারতীয় কমিটি তৈরি হয় তার কার্যকরী সমিতিতে সভাপতি মনোনীত হন ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদস্য সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখ করার মত।[৮৩] ৩মার্চ, ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দে কবির একটি বিবৃতি স্মরণীয়। স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য জানিয়ে বারবুস, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আবেদনসহ একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় 'স্পেন' নামে। রবীন্দ্রনাথের আবেদনের সারমর্ম হল: স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে ফ্রাঙ্কো যে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে তা আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের মদতপুষ্ট, শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান মাদ্রিদের জ্বলন্ত অবস্থায় শিশু ও নারীদেরও রেহাই নেই---কবি বলেন, 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। স্পেনে যে ধর্মান্ধতা, যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমানুষিক পুনঃপ্রচেষ্টা চলেছে তাকে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতেই হবে। বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।'[৮৪] কবি মানবতার বিবেকের সুরে প্রার্থীর মত কাতর আবেদন জানিয়ে স্পেনের গণ-ফ্রন্টের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান জানান, বজ্র কণ্ঠে ধ্বনি তোলার অনুরোধ জানান: 'প্রতিক্রিয়া দূর হও'। যে কবি স্লোগানের বাণীকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি, তিনিই স্পেনের বেদনায় বিচলিত হয়ে 'প্রতিক্রিয়া দূর হও' বলে আর্ত-চিৎকার তোলেন। ১৬জুলাই, ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দে সিটি কলেজে হুইটম্যানের শতবার্ষিকী-তে (উদ্যোগ প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গীয় শাখার) কবি বাণী প্রেরণ করেন, জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হলে (৭জুলাই, ১৯৩৭) কবি তাতেও অতিশয় বেদনাবোধ করেন, চীনের উদ্দেশে প্রেরিত পত্রে কবিকে বলতে হয়: জাপানের সাহসী সন্তানরা তাদের শাসকদের জন্যে ভ্রান্তপথে চলছে।[৮৫] এই সংগ্রামে কবি তাদের পরাজয় কামনা করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা মানবিকতার ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপ্রদ। এই বাণী প্রেরিত হয় ২১সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দে। এদেশে ২৬সেপ্টেম্বরে(১৯৩৭) 'চীন দিবস' পালিত হয় জওহরলাল নেহরুর বিশেষ উদ্যোগে। জাপান-প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জওহরলালের এই উদ্যোগ বন্ধ করার জন্যে কবিকে পত্র দেন।[৮৬] এই পত্রের জবাবে কবি স্পষ্টভাষায় বলেন, 'এশিয়ার অন্যান্য সকলের ন্যায় আমিও একদিন জাপানের অনুরাগী

ছিলাম, জাপানকে সম্ভ্রম দেখাইতাম এবং সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতাম যে, এতদিনে এশিয়া জাপানকে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ পাইয়াছে এবং নবলব্ধ বলীয়ান জাপান বৈদেশিক আক্রমণ হইতে প্রাচ্যের সংস্কৃতি রক্ষা করিবে। কিন্তু আমাদের সেই নবীন আশা মিথ্যা প্রমাণ করিতে জাপানের আদৌ বিলম্ব হয় নাই, ...আজ জাপানই এশিয়ায় প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু।'[৮৭]...

বাংলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে 'প্রগতি' সংকলন বেরোয় এই সময় (১৯৩৭), সংকলনটি কবিকে উৎসর্গ করা হয়। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে লিখিত পত্রে কবি তাঁর আশা ব্যক্ত করেন এই বলে যে, নবযুগের নূতন ধারার সঙ্গে আমাদের মিলতে হবে। তিনি বলেন, 'বস্তুবুদ্ধিপ্রধান চিন্তার ও ভাবের, ধর্মনীতির ও কর্মনীতির জোরালো হাওয়া আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করে ছুটেছে, এর ধাক্কা থেকে আমাদের মনও নিষ্কৃতি পায় নি। তোমার প্রগতি বইখানিতে তুমি তারই পরিচয় একত্র সংগ্রহ করেছ। বিশ্বব্যাপী মানুষ অকস্মাৎ এই যুগে তার জীর্ণ খোলসখানা ত্যাগ করতে উদ্যত। এর ভালো মন্দ পদ্ধতি এবং পরিণাম বিচার করিবার সময় এখনো হয় নি---নির্দয় দুঃখ এবং বিকৃতির মধ্য দিয়েও নূতন যুগ আবির্ভাবের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি।'[৮৮]... নতুন যুগের ভাবনাকে এভাবে অঙ্গীকার করার মধ্য দিয়ে কবির কেবল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে নি, এর মূলে আছে কবির পরিবর্তিত পরিস্থিতির সচেতন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের যুগোপযোগী চেতনা।

চীনের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে এই সময় ভারতের সাহায্য চেয়ে পাঠান এ্যাগনেস স্মেডলি এবং উক্ত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক চু তে কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলালের কাছে অনুরোধ জানান, এই আবেদনে সাড়া দেন কবিও। ৭ই পৌষ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, সকালবেলা ভাষণ দিতে গিয়ে চীনের সংগ্রামী ভূমিকাকে তিনি প্রশংসা করেন, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নীরবতা এ-ব্যাপারে তাঁকে খুশি করে নি, সেই মর্মবেদনা নিয়ে বলেন, 'আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক মৃত্যুগ্রস্ত---যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ...অপর দিকে আছে আপন-সাম্রাজ্য-লোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবদের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ...চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু, আমাদের কী করবার আছে? আমরা কী করতে পারি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি---কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? এই দুঃখবোধ-দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরাও সেই শক্তির পক্ষে কাজ করছি- এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও শক্তির কাজ।'[৮৯] এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের ভেতর দিয়ে বাহিত হচ্ছে, তার কারণ, তিনি বারবার জোর দিচ্ছেন এই কথাগুলির ওপর---'আমাদের অস্ত্র নেই', আমাদের সৈন্য-বল নেই', প্রশ্ন ওঠে, বিপুলশক্তির বিরুদ্ধে হিংসা-ই অস্ত্র কি না। এ-সম্পর্কে 'উত্তর-বর্ষ' (ইয়েট্স) প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে রোমাঁ রোলাঁ ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলাপচারী'তে উল্লিখিত বক্তব্য লক্ষ্য

করাঃ '১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন, আমি গান্ধীর অহিংসা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আর তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এখনও তিনি কিছু লেখেন নি। তাঁর অহিংসার ধারণা গান্ধীর মতোই অসম্পূর্ণ, কারণ দু'জনেই শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজনে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জনগণের সঙ্গে নেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিগত সমস্যাটি দেখেন। গান্ধী তা একেবারেই দেখেন না।'[10] অবশ্য সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর মত-পার্থক্যই স্বাভাবিক। উক্ত আলাপ ২৪সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের, এর মধ্যে বিশ্বপরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সৌম্যেন্দ্রনাথ নিজেই লক্ষ্য করেছেন কবিকে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়্যার'-এর সভাপতিরূপে, লক্ষ্য করেছেন স্পেনের সপক্ষে প্রচারকার্যে, চীনের সংগ্রামে সহায়তায়, লক্ষ্য করেছেন ফ্যাসিবিরোধী এক উজ্জ্বল ভূমিকায়, সেই রবীন্দ্রনাথই ২৫ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৮সংখ্যক কবিতায় দানবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে মানবকুলকে আহ্বান জানাচ্ছেন কবি এই বলেঃ

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস---
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'[11]

যে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে নৈতিক জীব বলে মনে করতেন, সেই রবীন্দ্রনাথই '[illegible] বুদ্ধ' মানুষকে এ পর্বে 'মানুষ-জন্তু' বলে বিশেষিত করতেও আপত্তি করলেন না, যে বিশ্বাস তিনি লালন করেছিলেন মনে মনে, সেই বিশ্বাস, বলাই বাহুল্য, ক্ষুণ্ণ হয়েছে এইখানে পৌঁছে, সমরবাদী বৌদ্ধরা, তাঁর কাছে বিদ্রুপের খোরাক হয়েছেন-- 'মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে বেরোল দলে দলে', বুদ্ধের পবিত্র আশীর্বাদ কামনা করেছে তারা 'যেন বিশ্বজনের কানে পিশাচমন্ত্র দিতে', 'যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে'---এই নির্বিচার অন্যায় ও ব্যভিচারে মানবতার পূজারী কবি আর কোথাও দেখতে পান নি আশার আলো, তাই সেইজন্যেই তাঁকে আহ্বান জানাতে হয়েছে 'সংগ্রামের'। অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয় ঠিকই বলেছেন, 'এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী সমগ্র প্রগতিশীল কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একাত্ম।'[12]

রবীন্দ্রনাথ মানবমুক্তির সংগ্রামকে কখনও তুচ্ছ করে দেখেন নি, চেক-জাতির পক্ষে কারল চ্যাপেকের শান্তি-প্রার্থনার উত্তরে এক বাণীতে;[13] ১জানুয়ারী, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০টাকা চীনাদের সাহায্যের মধ্য দিয়ে, ১৪এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা পত্রে[14], ২৮জুন, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক তান য়ুন-সানের উদ্দেশে বাণী প্রেরণের মধ্যদিয়ে কবির ন্যায়পরায়ণ বিবেকী মানবপরিচিতি আর একবার জাগ্রত হয়ে উঠেছে যেন। এই অধ্যাপকটির উদ্দেশে লেখা চিঠিতে বলেন, 'যদি আপনারা একলেই বাহাত জুড়াত নাও করিতে পারেন তথাপি

আপনাদের নৈতিক জয় মলিন হইবে না। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জয়ের বীজ আপনাদের গভীরতম অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবে তাহা পুনঃপুনঃ অমর হইয়া প্রকাশিত হইবে।'[১৫] মার্শাল চিয়াং কাইশেকের উদ্দেশে লিখিত একটি পত্রেও কবি চীনকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করে জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দিক থেকে আদর্শগত লড়াই চালান।[১৬] এই পত্রটি সম্ভবত প্রাচ্য-এশীয়দের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জাপানের কবি ইয়োনে নোগুচির গোচরে এসে থাকতে পারে। ২৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নোগুচি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে একটি খোলা চিঠি লেখেন। দেশীয় সংবাদপত্রে সেটি ২৮ অগাস্ট, মডার্ন রিভিয়ু'তে অক্টোবর সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে বেরোয়। অংশবিশেষের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হল: নোগুচি লিখছেন, 'আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্তমান চীন-যুদ্ধ পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের ফল, তবে আপনি ভুল করিয়াছেন। আমার মতে এই যুদ্ধ তো উন্মত্ত কসাইবৃত্তি নয়ই বরং ইহা বিরাট এশিয়া মহাদেশে এমন এক জগৎ রচনার একমাত্র উপায় ---ভয়ঙ্কর হইলেও একমাত্র উপায়--যে জগতে নিজে বাঁচিয়া থাকা ও অপরকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়ার নীতি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এশিয়া যাহাতে এশিয়াবাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্যই এই যুদ্ধ। সর্বোচ্চমাত্রায় দৃঢ়তা ও শহীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।'[১৭] ১সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি তার যোগ্য জবাব দেন, বলেন, 'জাপানে আমার বক্তৃতায় আমি যখন "পাশ্চাত্যের অনুকরণের" বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তখন ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সাম্রাজ্যস্পৃহার সহিত বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট প্রচারিত পূর্ণতার আদর্শ এবং যে মহান সংস্কৃতি ও প্রতিবেশীপ্রীতি লইয়া এশিয়া ও অন্যান্য স্থানের সভ্যতা গঠিত, তাহার তুলনা করিয়াছিলাম। মহান বীরত্বের খ্যাতিসম্পন্ন বুশিদোর দেশকে আমি সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়াছিলাম যে, এই বৈজ্ঞানিক বর্বরতা যাহা পাশ্চাত্যের মানবতাকে গ্রাস করিয়াছে এবং তাহার অসহায় জনসাধারণকে ধ্বংস করিয়া তুলিয়াছে তাহা কোন পৌরুষসম্পন্ন জাতির পক্ষে---যে জাতি অভ্যুদয়ের পথে চলিয়াছে ও যাহার সম্মুখে বিরাট ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, কখনও অনুকরণযোগ্য হইতে পারে না। "এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য" এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে উহা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইউরোপের নিন্দনীয় অনুকরণ রহিয়াছে। রাজনৈতিক গণ্ডী ছাড়াইয়া যে বৃহত্তর মানবতা আমাদিগকে এক করিয়া দেয়, উহার মধ্যে তাহার কিছুই নাই।'[১৮] কবি ঠিকই বুঝেছিলেন, 'বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা'ও এ যুগের একটি ঘোর 'দুর্লক্ষণ'। যে নির্লজ্জতার সঙ্গে নোগুচি যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, সৈন্যতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন, তা প্রচার-শিল্পক্ষেত্রে যে বিষ ছড়ায় তাতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে সমুহ পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ একে কখনই সমর্থন করেন নি। নোগুচি আবার একটি চিঠি পাঠান। প্রকারান্তরে

তিনি এই চিঠিতে স্বীকার করেন যে, জাপান যদিও আক্রমণকারী, তবুও তার আক্রমণের উদ্দেশ্য নেই, তাঁরা এমন একটি প্রতিবেশী চান যাঁরা শক্তিমান ও সংযুক্ত, নতুন ব্যবস্থায় যাঁরা এশিয়ার পুনর্গঠনে সাহায্য করবে-- অর্থাৎ, চীন তার স্বাতন্ত্র্য বাদ দিয়ে জাপানের শর্তের নিকট নতিপ্রণত হবে। পৃথিবীতে যুদ্ধবাদীর দল চিরকাল এইভাবে তাঁদের অজুহাত তৈরি করেন, আর বুদ্ধিজীবীরা অনুগামী দাসের মত যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার-কার্যে অংশ নেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯অক্টোবরে লেখা পত্রে কবি তার যোগ্য উত্তর দেন।[৯৯] তিনি বলেন, 'আমি এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি যে, আপনি এখনও আমাকে আপনার মত গ্রহণ করাইবার জন্য এরূপ পরিশ্রম স্বীকার করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। আমি একান্ত যথার্থই দুঃখিত যে, আপনি আমাকে যেরূপ বুঝাইতে চাহেন আমি সেরূপ বুঝিতে অক্ষম।' কবি প্রশ্ন তোলেন, 'একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবেও কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, যে রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপ এবং বোমাবিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত শহরসমূহ প্রত্যহ আপনাদের দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব বিস্তৃত করিতেছে তাহা দ্বারা আপনাদের দুই জাতির পক্ষে স্থায়ী সদ্ভাব স্থাপনের জন্য হস্ত প্রসারিত করা সহজ হইতেছে ?...আমার কথাগুলি যদি কটু মনে হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিশ্চিত জানিবেন যে গভীর দুঃখ ও লজ্জাতেই এই পত্র লিখিতেছি,-- রাগ করিয়া নহে। চীনারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা বেদনাদায়ক ও মর্মভেদী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনঃকষ্টের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। জাপান বস্তু দেখাইতেছে, গর্ব-ভরে এমন কোন দৃষ্টান্তের প্রতি কাহারও প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াও আমি আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছি।' নোগুচি কবিকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি ভূমিকা পালনের কথা বলেছিলেন, কবি তার জবাবে বলেন, 'আপনি তো জানেন, যে নৈতিক প্রভাব বিস্তারকে আপনি এমন উচ্চকণ্ঠে বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আমার অন্য কোন শক্তি নাই। আপনি আমাকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা যদি প্রথমে আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে আপনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে আমি চিয়াং কাই শেককে আত্মরক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিতে পারি ?'[১০০] চিঠি টি তাকে পাঠাবার পর (?) ক্যান্টন ও হ্যাঙ্কাও শহরের পতন-সংবাদ কবির কানে এসেছে। ১সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ অটলের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয় চীনে, কবি এই যাত্রায় তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠান।[১০১] এইভাবে চীনের মুক্তিসংগ্রামকে সর্বপ্রকারে নৈতিক ও আর্থিক সহায়তায় ধন্য করে তোলেন কবি।

॥ ৭ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে চেকোশ্লোভাকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংকটে ইঙ্গ-ফরাসির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি-নির্ধারণ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবিও গভীরভাবে মর্মাহত হন। বিপন্ন চেকদের

সহানুভূতি জানিয়ে বন্ধুবরের দেশটিকে কবি লেখেন: 'আপনাদের দেশের জনগণ যে দুঃখভোগ করছে সে-সম্পর্কে আমার অনুভব এত তীব্র যে মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন ছিলাম।...এই ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেল---তিন শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্যের জনগণ মানবতার যে-সব নীতির জন্য শহীদ হয়েছে সেগুলো রক্ষার ভার এসে পড়েছে কতিপয় কাপুরুষ রক্ষকের হাতে যারা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে গিয়ে সেগুলো বিকিয়ে দিচ্ছে। যখন এমনকি উৎপীড়করাও এসে অপরকে মদৎ দিচ্ছে তখন যদি দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক জাতিগুলি একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তখন আর আশাভরসা করার কিছু থাকে না।'১৩২ ৪অক্টোবর,১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত(১৭আশ্বিন,১৩৪৫) 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্দেশে নিবেদিত:

'উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে--
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।
...   ...
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় বেয়ে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক ছেয়ে।'১৩৩

১১নভেম্বর,১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দটি ভারতবর্ষে পালিত হয় 'যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' হিসেবে। ১৮নভেম্বর(১৯৩৮) তুরস্কের মুক্তি-আন্দোলনের নায়ক কামালপাশার মৃত্যুতে বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ বন্ধ থাকে। কবি এই নেতাকে তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। ২৪,২৫ডিসেম্বর,১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র যে দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠান। সম্ভবত কবির মনজুড়ে এই সময় কামালপাশার বিদ্রোহী মূর্তিই অঙ্কিত ছিল। প্রবন্ধটিতে১৩৪ কবি প্রাচীন এশিয়ার সুপ্ত দেখেছেন আর দেখেছেন কামালপাশা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তুর্কিকে কিভাবে দুর্দিনে পথপ্রদর্শন করে নির্ভীক ও মুক্তির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন---তাঁর সেই একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা কবির মুগ্ধ কৌতূহল আকর্ষণ করেছে। সবশেষে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রগতিপথের তরুণ যাত্রীদের এশিয়ায় নবগৌরবের ইতিহাস মুক্তির জন্য। ৩০নভেম্বর,১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যান্ড আক্রমণের আগে আমাদের দেশে সোভিয়েট-বিরোধী

একটা আবহাওয়া ছিল, এই ঘটনা পরবর্তীকালে কবিকে নানাভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ৩সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ শুরু হলে বৃদ্ধ কবি যে কী মর্মবেদনা পেয়েছিলেন তার সাক্ষ্যই প্রকাশ পেয়েছে লেখায়, চিঠিতে বা সংগীতে। বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকতে চেয়েছেন কবি, তাঁর চোখ এড়ায় নি কোন ঘটনাই, বিশেষ করে বিশ্বের স্বার্থ যেখানে জড়িত। এই সচেতনতা আর কোন রাজনীতিবিদের ছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জাগার কথা। ৬মে, ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে 'লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতাকে কবি কোনমতেই ক্ষমা করতে পারেন নি, যুদ্ধের বিপদ কিভাবে ঘনিয়ে উঠেছে কবি তা লক্ষ্য করে বলেছেন, 'আজকের দিনে চেম্বারলেনি সঙ্কটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বারলেন পায়ে পড়ে হাতাহাতে ফ্যাসিস্টবৃন্দের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত যুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতাতে আক্রান্ত চেকোস্লোভাকিয়াকে নাৎসি পদতলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখেও অনায়াসে লজ্জা সম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলন্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাঁকে ও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় লেগে ওঠে নি।'[১০৫] ২০মে, ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে লেখা চিঠিতে তাঁর গভীর উপলব্ধি: 'পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উৎপাদিত করে। ইম্পিরিয়ালিজম্, বড়ো ক্যাপিটল বড়ো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে।'[১০৬] এই কথাগুলিতে সত্যই প্রকাশ পেয়েছে, সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বললেও জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিও কবি এতে ইঙ্গিত করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও স্বৈরতন্ত্রী হিটলার ও মুসোলিনির নামে জয়ধ্বনি দেবার প্রবণতা দেখেই কবির এই বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরে ছিদ্র পড়ার আশঙ্কাকে কবি গোপন করেন নি। কবি অনুভব করেন, যে অশান্তি আজ বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছে, তার থেকে মানুষকে দূরে রেখে শুচি রাখা এক অসম্ভব ব্যাপার। কবির মর্মমূলে গভীর ব্যথিত বিষাদ, বলেন, 'এই অশান্তি দূর করিবার জন্য আমাদিগকে আর কতকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে? রক্তাপ্লুত ধরণীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র তাঁহারাই প্রার্থনা করিতে পারেন যাঁহারা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারা কখনও পাশবিকতার আশায় ধ্রুবকে বিস্মৃত হন না।'[১০৭] যুদ্ধ ঘোষিত হলে পর এদেশের বুদ্ধিজীবীরা ৮সেপ্টেম্বর(১৯৩৯)-এ বাংলাদেশে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সর্বাগ্রেই পাওয়া যায়। এই বিবৃতিতে ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে নৈতিক সমর্থন জানানো হয়, তবুও এর মূল্য ছিল, ভারতের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের বিষয়টি---ভারতবর্ষে স্ব-শাসন প্রবর্তন করার সুযোগ সৃষ্টি।[১০৮] এই সময়েই কলকাতায় গঠিত হয় 'ইন্দো-পলিশ এ্যাসোসিয়েশন' যার সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। এক বাণীতে তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'এই

এ্যাসোসিয়েশন আমাদিগকে আমাদের অধিকার উপলব্ধি করাইবে এবং কলা ও সাহিত্যের সহযোগিতা দ্বারা উহা বর্ধিত করিবে।'[১০৯] ১০সেপ্টেম্বর,১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে আর একটি প্রেস-বিবৃতির মাধ্যমে কবি যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরেন, 'আমাদের বাণী হয়তো জার্মানীর সেই শক্তিমান নায়কের নিকট পৌঁছিবে না---উদ্ধত গোলার শব্দ ভেদ করিয়া এই বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। তবে আমার আশা এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞের রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধরণী পুনরায় শুচিস্নাত হইবে---ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় ঘোষিত হইবে।'[১১০] কবির মর্মবেদনা চিঠিপত্রেও প্রকাশ পায়, ১৮সেপ্টেম্বর,১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন: . . .'যে মহাদুর্গকে আমি ঠেকাতে পারিনে এমন কি স্বয়ং চেম্বারলেনের হাতেও পারে না, কী করব তার মার খেয়ে, ধিক্কার দিতে পারি---নিরবধি শতাব্দীর প্রচণ্ড গর্জনের কাছে সেটা শোনাবে অত্যন্ত হাস্যকর। কবির আলটিমেটাম দেওয়া হয়ে গেছে---তার মেয়াদের শেষ তারিখ হয়তো বা তিনচার শতাব্দী পরে। আমার যা বলবার, তার শেষ কথা বলে দিয়েছি---পড়ে দেখো বলাকার ১০পৃষ্ঠায়--'ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি, মাথা করো নত,---/এ আমার, এ তোমার পাপ--/বিধাতার বক্ষে এই তাপ/বহুযুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়---/ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,/লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,/বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,/জাতি অভিমান,/মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান/বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া/ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।' কবি আরও বললেন, 'আমার যদি জোর থাকত তাহলে এই কবিতার সমস্তটা আমি মানববিশ্বের কাছে পড়ে শোনাতুম।'[১১১] কবির মানসিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় আবার জয়-প্রার্থনায়, দেশে দেশে যারা অসুর শক্তকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে, তাদের জন্যেই কবির কামনা---'এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।'[১১২] সবচেয়ে বেশি বেদনা তাঁর চীনের জন্যে, কারণ 'সহায়শূন্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্য হাতে'। যুদ্ধের অর্থ কবির কাছে স্পষ্ট---'মানব-দমন', এর জন্যে 'মনুষ্যত্বের পরীক্ষায়' পাশ করার দরকার হয় না। যুদ্ধে এক পক্ষের সাফল্য আসবেই, কিন্তু তা বর্বরতার উপরে সভ্যতার জয়লাভ', এই বর্বর হিংস্র শক্তি মনুষ্যত্বকে অপমানিত করেই তার আনন্দ চরিতার্থ করে, কবি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পান: 'যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা জয় পাবে যাকে সে বলে জিত। তারপর চলবে সেই কাঁটাগাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিদ্ধ করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি, এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয়কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।'[১১৩] ডিসেম্বরের শেষদিকে (৭ই পৌষ) ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে 'অন্তর্দেবতা' শীর্ষক ভাষণেও একই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। খ্রীষ্ট জন্মদিনে 'বড়োদিন' শীর্ষক

একটি কবিতায় তাঁর মনের ক্ষোভ ও বেদনা এইভাবে প্রকাশ পায়ঃ

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি---
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের সুর---
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'[১১৪]

২৫জানুয়ারী, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে মহোৎসবের ভাষণে আত্ম-অসম্মানের হাত থেকে জাতিকে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছেন, বলেছেন, 'য়ুরোপে যুধ্যমান জাতির প্রত্যেকে অন্যকে মারছি মনে স্থির করেছে, কিন্তু মারছে সে নিজেকে। নিজে আঘাত পাবে অন্যকে মারবে বলে, কিন্তু 'পরকে মারার অস্ত্রঘাত বার-বার ফিরে উঠবে।' অন্যদিকে দেশের কথাও তিনি বলছেন, 'এদিকে ভারতবর্ষে এক পক্ষ অন্যপক্ষকে অসম্মানের আঘাত ক'রে নিজের প্রতি আঘাতকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখছে। আমরা 'আত্মহনো জনাঃ' আমরা দীর্ঘকাল তমসাবৃত লোকে রয়ে গেলুম আত্মঘাতের পাপে। আশ্চর্যের এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতের কল্যাণবাণী ঐক্যবাণী সকলের চেয়ে অশ্রদ্ধা পেয়েছে ভারতবর্ষে।'[১১৫] রবীন্দ্রনাথ এই যুদ্ধ, মানবতার অপমান, লাঞ্ছনা ইত্যাদির মধ্যে কখনও কখনও হতাশাকেও মিলিয়ে দিয়েছেন, আবার তাঁরই মধ্যে এক প্রবল মৃত্যুঞ্জয়ী চেষ্টা দেখা গেছে এই বাধা উত্তরণের, এমনও বলেছেন, ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত জনগণ জীবন ও স্বাধীনতার 'গৌরব' লাভ করবে। ২২মে(১৯৪০) রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটিতে 'রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের' ফলে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি, যে 'সর্বনাশা স্রোত', যে 'আদিম বর্বরতা', যে 'পঙ্কিল চিত্তের বিকার' যা নাকি 'শত শত বর্ষের পাপের ঝুঁটি', এরও অবসান হবে বলে কবি সুদ্রষ্টার মত তা দেখেছেন, আর তখনই তো মুক্তির যথার্থ পরিবেশ তৈরি হবে---

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে---

আর সেই মুক্তির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।'[১১৬]

রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রথমকার উত্তেজনা যেন কমিয়ে এনেছেন। নিজের ভেতরকার বিষাদ ও হতাশা কাটিয়ে উঠে মৃত্যুর কল্যাণস্পর্শকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন এই পর্বে। বর্তমান পরিস্থিতি আর উদ্বেগ নয়, নিঃশঙ্ক মনের আশাবাদী পরিচয়। অমিয় চক্রবর্তীকে একটি পত্রে লিখছেন, 'মনে আশা হচ্ছে যাকে ঘোর দুর্যোগ একটা মহৎ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন বিশেষী, তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তোলে, মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেননা তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে।'[১১৭] এই পর্ব বাস্তবিকই কবির কাছে মুক্তদর্শনের কাল, এই সুর আঁকা হয় রবীন্দ্র-মানচিত্রে এক নতুনতর উজ্জ্বলতর বৈশিষ্ট্যরূপে, 'জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে' যে মহাকাল চলেছে সম্মুখের দিকে, সেই মহাকাল কোন চিহ্ন রাখে কি সংসারের কোথাও: 'আরবার সেই শূন্যতলে/ আসিয়াছে দলে দলে/ লৌহ বাঁধা পথে/ অনলনিশ্বাসী রথে/ প্রবল ইংরেজ,/ বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।/ জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,'-----এরও কোন চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু সুদ্রষ্টার চোখ যখন মাটির পৃথিবীর দিকে, তখন তিনি দেখতে পান আর এক পৃথিবী---

'মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।'[১১৮]

'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে' এইসব শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। মানব বিশ্বকে কবি দেখলেন শ্রমজীবীর রক্ত-ঘাম-অশ্রুর সু-রূপে। গণজীবনের কথা কবি খুব কম লেখায় বলেছেন, এটা নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল প্রগতি সাহিত্যিকদের। প্রশ্ন তুলেছিলেন সমালোচক, 'যাঁর দৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা অতলস্পর্শ, যাঁর রূপদক্ষতা অতুলনীয়, তিনি এমনভাবে সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে কেমনভাবে

অনাবিল 'সৌন্দর্য' ও রত্নাস্বাদসুরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারলেন'[১১৯] ---এরপরও প্রশ্ন সম্পর্কেও কবিও ছিলেন খুব সচেতন, 'প্রশ্ন নি' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলেছেন: 'মানুষের অপমান দুর্বিষহ দুখে/উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,/বুঝিনি করিতে প্রতিকার---/চিরঋণ রয়ে গেল প্রাণে ধিক্কার তাহার'[১২০]। এ কথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্যকীর্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ২১জানুয়ারী, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিতায় তাঁকে বলতে শুনি, তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয় নি, তাই আত্মীয়তা অর্জনের জন্যে তাঁকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হচ্ছে সেই কবির---

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।'

অতঃপর সেই মহান আহ্বান:

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার---[১২১]

কবি এইভাবেই জনজীবনের মিছিলে নেমে এসেছেন, পায়ে পায়ে হয়ত-বা পা মেলান নি, তবুও তাঁর অন্তরে কোথাও ফাঁকি ছিল না, ছিল সত্যেরই অন্বেষণ। বস্তুত এই অন্বেষণই তাঁকে প্রগতিশীল করে তুলেছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই ভাবনার শরিক ছিলেন তিনি।

জার্মানির খবর-সংবাদ-এর কিছুদিন পরেই লেখেন 'দস্তুর সভ্যতা'। রচনাকাল ১০জুন, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দ। অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে বলেন, 'বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কলের দিকে গোপনে দাঁতগুলো কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলছিল আজকের দিনে বড় করে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণভাবে সেটা প্রকাশ পেল', কবির কন্ঠে এখন আর সেই আগেকার হতাশা নেই, বরং দৃঢ় বিশ্বাস: 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়।'[১২২] ১২ডিসেম্বর, ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে পৌষ-উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে কবি বলেন, 'এসময়কার মহাযুদ্ধের অধিনায়কদের অন্তত এক পক্ষ বলে থাকেন, তাঁরা সমস্ত মানবের জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু নিজেদের গণ্ডির বাহিরের মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না, উদ্ধত লোভরিপুর এই লক্ষণ।'[১২৩] কবি ঠিকই বলেছেন, যাঁরা সুযোগ বুঝে 'মৈত্রীশক্তি'তে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য খুব একটা মহৎ নয়, কারণ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে এই লক্ষণটি থাকার জন্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তথা দুর্বল রাষ্ট্রগুলির পক্ষে কখনও তা হিতকারক হয় না। অন্তিম পর্বে কবি আর একবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বণিকবৃত্তির বিরুদ্ধে

ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেন। ব্যক্ত করেন বর্তমান সভ্যতার সংকট এবং এই সংকটের মূল কোথায়। বস্তুত আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর বিশ্বসভ্যতা ও মানবতার প্রতি একই সঙ্গে আস্থা আর আস্থাহীনতা ফুটে উঠেছে যা কবির অন্তর্দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। ইংরেজের সান্নিধ্য ও ঔদার্যসম্পর্কে কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবি মন্তব্য করেছেন: 'বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে---এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া।' অথচ 'ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিক থেকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।' অন্যদিকে ইংরেজশাসক তার উপনিবেশ দেশসমূহের জন্যে শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার ছাড়া কিছুই দেয় নি পদানত জাতিকে। কিন্তু রাশিয়া ? 'এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে।' সেজন্যে কবি একই সাথে 'ঈর্ষা' ও 'আনন্দ' অনুভব করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ন্যূনতম মানবিকতার শর্ত পালন করে নি। প্রসঙ্গত কবি চীনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বন্দুকের নল দিয়ে তার মুখে ঠেসে পুরেছে আফিং। স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সুকৌশলে সরিয়ে দেবার দায়ে ইংরেজকে দায়ী করেছেন কবি। অবশ্য প্রশংসাও করেছেন তাঁদের যাঁরা সহযোদ্ধার মনোভাব নিয়ে দুর্দিনে স্পেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবির আস্থা ছিল ইংরেজের প্রতি, সভ্যতার সংকটে তাঁরা নেবেন পরিত্রাতার ভূমিকা: 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।' সবশেষে বলে ওঠেন কবি, . . .'কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'[১২৪] প্রবন্ধটি রচিত হয় ১বৈশাখ, ১৩৪৮বঙ্গাব্দে(মে, ১৯৪১)। ৫জুন, ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দে মিস র‍্যাথবোনের উদ্ধত ও অশালীন পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আর একবার উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠেন। অপমানিতের পক্ষ থেকে কবি রুখে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'এক কালে ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, কিন্তু মিস্‌ র‍্যাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্ত চুম্বন করিব, কেননা তাহাদের সেই হাত আমাদের পায়ে দাসত্বের

সুজান পড়াইয়া দিয়াছে। কোনো একটি গবর্মেন্টকে ভালো কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না, সেই গবর্মেন্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়।'[১২৫] বলদৃপ্তের গর্বিত অধিকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে শুধু সোচ্চারই নন, অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠও বটে। আর এভাবেই তিনি ঔপনিবেশিকতার মূলে কুঠারাঘাত হেনে অত্যাচারিতের খুব কাছে চলে আসেন।

॥ ৮ ॥

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয়, বিশেষ করে, যে সমাজে পুঁজির অসমবিস্তৃত বিকাশ হয়েছে এবং নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রিক প্রলেতারিয়েতেরও উদ্ভব ঘটেছে---সেই সমাজের ভেতরে থেকে ফিউডাল ও ধনবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন দ্বৈততায় প্রকাশ পাবে তার বিবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতায় উপস্থাপিত। আমরা শুধু তাঁর মধ্যে বিরোধই লক্ষ করি নি, কখনও কখনও এই বিরোধের পরিণামও তাঁর মধ্যে লক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধের ভেতর থেকেই নিজের চলার পথে পথে, বাঁকে বাঁকে, জগৎ ও জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনার অন্তঃস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনের দাবিকে তার সদ্-মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করার নিরবধি প্রয়াস পেয়েছেন। লক্ষ করেছেন মানুষের ইতিহাসের অন্তরে অন্তর্গূঢ় এক প্রাণবান মহতের স্থান বিচিত্র সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপে কীভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে (লক্ষণীয় 'ঐ মহামানব আসে' গানটি)। এদিক থেকে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী এবং তারই উত্তরাধিকার অনেকাংশে বর্তেছে প্রগতিশীল সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর ওপর।

উল্লেখপঞ্জী

১। মলিনা রায়, অনুদিতঃ রবীন্দ্রনাথ-একগুচ্ছ পত্রাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ২
২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৪৯৬
৩। মলিনা রায়, অনুদিতঃ রবীন্দ্রনাথ-একগুচ্ছ পত্রাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ২৭
৪। তদেব, পৃঃ ২৬
৫। তদেব, পৃঃ ২৯-৩০
৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ২৮৭-৮৮
৭। ,, ত্রয়োদশ খণ্ড, ,, ,, পৃঃ ২৩১
৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ৪২-৪৩
৯। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম(রোমাঁ রোলাঁর 'আমি থামিব না'), অরুণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ ১১
১০। তদেব, পৃঃ ১২
১১। তদেব, পৃঃ ১০৮
১২। চিন্মোহন সেহানবীশঃ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৬৮
১৩। সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্যঃ-পরিচয়, (প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনাসংকলন), মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৭৪
১৪। তদেব, পৃঃ৩৭৪-৭৬
১৫। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১৬৯-৭০
১৬। মৈত্রেয়ী দেবীঃ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নয়া দিল্লী, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৮
১৭। ইটালিতে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন দু'বার। প্রথমবারে ১৯২৫খ্রীষ্টাব্দের ২১জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী অবধি ছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯২৬খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। প্রথমবারের ভ্রমণে সম্ভবত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওঁার কথা নয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, প্রথম ভ্রমণেই তিনি ইটালির রাজনৈতিক অবস্থা আঁচ করেছিলেন। ডিউক স্কোত্তির সঙ্গে পরিচয়ের পরে কবির লেখা উদ্ধার করেছেন তিনি--- 'Duke Scottie of Milan, told me that his mouth was shut. Formichi told me that Duke Scottie was an incorrigible anti-fascist. While I had been talking with the Duke, from time to time, he got extremely nervous so that I did not get an opportunity of having a quiet talk with the Duke.'
১৮। রোলাঁর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯এপ্রিল, ১৯২১খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে কবি এবং কবিপুত্র একাধিকবার সাক্ষাতের চেষ্টা ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়বার ইটালি ভ্রমণ সেরে রোলাঁর সঙ্গে আবার দেখা করেন কবি।
১৯। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম(রোমাঁ রোলাঁর 'আমি থামিব না'), অরুণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮০, পৃঃ ৪৫
২০। এই সাক্ষাৎকার অতি নাটকীয়। চমৎকার এই বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্যঃগোপাল হালদার সম্পাদিত 'বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য', মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৪

২১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৪৮-৪৯

২২। তদেব, পৃঃ২৫১-৫২

২৩। রবীন্দ্রজীবনীকার এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন যে মুসোলিনির সঙ্গে আলোচনার সময় ক্রোচের খাস তরুণ ক্যাপ্টেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্যাসিবিরোধী। আরও লিখেছেন, ফর্মিকি কবির সঙ্গে ক্রোচেকে কথা বলতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ২৫২)। অন্যদিকে 'পিতৃস্মৃতি'তে রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, বিদেশ যোত্তির সঙ্গে এ-বিষয়ে আগেই নাকি আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি সাহায্য করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যাখ্যান করে মুসোলিনিকে সরাসরি সাক্ষাতের প্রস্তাব দেন। মুসোলিনি এই ভার দেন ফর্মিকিকে। (পিতৃস্মৃতি, পৃঃ২০৫)। এক্ষেত্রেও এই ভার পালন করতে এগিয়ে আসেন যোত্তি-নির্দেশিত সেই তরুণ ক্যাপ্টেনটি। রোলাঁ প্রশান্ত মহলানবীশের কাছে আরও একটু ভিন্নভাবে শোনেন সেই ঘটনাটি। (ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী, পৃঃ১০৬)। রোলাঁ তাঁরা ডায়েরিতে আরও একটি তথ্য যোগ করেছেনঃ 'বেনেদেত্তো ক্রোচে এসেছিলেন গুরুর(মুসোলিনির)হুকুমনামায়'(টৌনিগ্রাম দেখে)। পৃঃ ১০৬

২৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ২৫২

২৫। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী(রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে') , র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১০৮

২৬। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ২০৫-০৬। লেখক নিজেও উপস্থিত ছিলেন ন সেখানে। প্রশান্ত মহলানবীশও ছিলেন না। এটা লক্ষ করার।

২৭। তদেব, পৃঃ২০৬

২৮। তদেব, পৃঃ২০৭

২৯। এক্ষণ, শারদীয়, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১-২সংখ্যা, ১৩৮৪। দ্রষ্টব্যঃ অবন্তীকুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাথের ইতালি-সফর ও রম্যাঁ রলাঁ' প্রবন্ধটি।

৩০। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী(রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১৭৭

৩১। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা , কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৩

৩২। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তঃ কালান্তরের পথিক রম্যাঁ রলাঁ, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ৫৭

৩৩। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী(রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১০২

৩৪। রোলাঁ বলেন, 'ইতালির যুবশক্তির যে প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কথা বললাম,--- বললাম মিলানের তরুণ ছাত্রদের কথা, যাদের শিক্ষকেরা ত্যাগ করেছে, নিন্দা সতর্কতা করেছে,-- নিবাসের উদ্বেগজনক রাজনীতি-বিরাগের কথা, অসম্পাদিত-বিবেক, লজ্জায় ও নৈতিক বেদনায় পীড়িত আদর্শবাদী যাজকীয়কর্মীদের কথা,-- নিহত অগ্রণী আমেনদোলার কথা,-- নির্বাসিত এবং ঘাতকের ভয়ে সর্বদা ভীত সৎ সাবুজেবিখির কথা,--ইত্যাদি।' ---তদেব, পৃঃ ১০২

৩৫। তদেব, পৃঃ১০৪-০৫

৩৬। তদেব,

৩৭। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৫-৬

৩৮। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইটালির তদানীন্তন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইউরোপীয় মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রচারকার্য---এই উভয় সংকটে পড়ে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। ৫ জুলাই, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম সালভাদোরির কাছে ফ্যাসিস্টবাহিনীর অত্যাচারের বহু অভিযোগ শোনেন তিনি। এমনকি ভিয়েনায় থাকাকালীন কবি দেখা করে থাকতে পারেন 'আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন'এ। মাত্তেওত্তি হত্যামামলার উকিল এবং ইটালির সমাজতন্ত্রী দলের নেতা মোদিগলি-য়ানি এবং সমাজতন্ত্রী নেত্রী অ্যাঞ্জেলিকা বালাবানফ কবির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে মুসোলিনি-অনুসৃত ফ্যাসিবাদী নীতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ অবহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হন। অতঃপর তিনি ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হন।

৩৯। এক্ষণ, শারদীয়, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৪। দ্রষ্টব্যঃ অবন্তীকুমার সান্যালের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের ইতালি-সফর ও রোমাঁ রলাঁ', প্রসঙ্গত বলা দরকার, চিঠিটি ২১ জুলাই, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এবং 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে' ৫ আগস্ট (১৯২৬) প্রকাশিত।

৪০। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী (রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১৫৪-৫৫

৪১। তদেব, পৃঃ১৫৬

৪২। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তঃ 'ভারতবর্ষের পথিক রম্যাঁ রলাঁ, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ৬০-৬৪

৪৩। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় ফ্যাসিবাদের প্রতি রবীন্দ্র-বিরোধিতা সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেন। প্রবাসী প্রকাশনী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পি. ডায়ের গ্রন্থ 'মুসোলিনি এ্যান্ড দ্য কাল্ট অব ইউরোপ' নামের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে যার প্রধান উৎসাহদাতা এই অশোক চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বইটি তাঁকেই উৎসর্গিত।
বিস্তৃত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের 'ভারতবর্ষের পথিক রম্যাঁ রলাঁ'ঃ ৫৯

৪৪। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী, (রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১৭৮-৭৯

৪৫। দ্রষ্টব্য চিন্মোহন সেহানবীশের গ্রন্থে প্রদত্ত ফটোকপি, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৮১

৪৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ১১১

৪৭। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৮-৯

৪৮। The Modern Review, Vol. XIV, No. 4, Whole No. 262, October, 1928, p. 373

৪৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ৩২৯

৫০। The Modern Review, Vol. XIV, No. 4, Whole No. 262, October, 1928, p. 373

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ 'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত', রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৯

৫২। সরোজকুমার দত্ত, অনুদিতঃ শিল্পীর নবজন্ম (রোমাঁ রোলাঁর 'আমি থামিব না'), অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃঃ১০৮-৪৭ এবং ১৪১

৫৩। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী (রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১৬১

৫৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬১, পৃঃ৩৮০-৮১

৫৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৬৭১

৫৬। তদেব

৫৭। তদেব, পৃঃ৭১৮

৫৮। সৈলেন চৌধুরী, সংকলন ও সম্পাদনাঃ 'তীর্থদর্শনে'র পঞ্চাশ বছর, 'সোভিয়েত দেশ' অফিস, কলকাতা, ১৯৮৪, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃঃ৫১

৫৯। তদেব, পৃঃ৭২

৬০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ১২২

৬১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃঃ১৪৬

৬২। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ১৬৫-৬৬

৬৩। তদেব, পৃঃ১৬৬-৬৮

৬৪। তদেব, পৃঃ২৯২

৬৫। তদেব, পৃঃ৩২১-২২

৬৬। 'কালান্তর', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ২১৫-১৬

৬৭। দ্রষ্টব্য মৈত্রেয়ী দেবীর 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' প্রবন্ধটি।-পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১১বর্ষ, ৪৪-৪৫ যুগ্ম সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃঃ১৭৫

৬৮। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী (রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ১৭৯-৮০

৬৯। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ৫১২

৭০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ৫০০-০৪

৭১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ১৩০-৩৪

৭২। তদেব, পৃঃ১৪১-৪২

৭৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ৩৭

৭৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ১৬৬-৬৭, --প্রসঙ্গত বক্তব্যঃ এই চিঠির তারিখটি ২৫মার্চ, ১৯৩৫খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে। আবিসিনিয়া আক্রমণ হয় ২, মতান্তরে ৩ তারিখে), 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', তৃতীয় খণ্ডে, নেপাল মজুমদার উল্লেখ করেছেন ২১জুলাই, ১৯৩৬খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ৬১৮)। প্রদত্ত তারিখটি তাই সন্দেহজনক।

৭৫। তদেব, পৃঃ১৬৬
৭৬। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিতঃ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খন্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৯, পৃঃ৫৫
৭৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৫১০-১৪
৭৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ৭১
৭৯। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী(রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ৪৭৬
৮০। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ'পরিচিতি-স', প্রগতি, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪বঙ্গাব্দ
৮১। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থ খন্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ১৪
৮২। তদেব, পৃঃ১৩৩
৮৩। শীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিতঃ পরিচয়(প্রতিরোধ প্রতিদিন/ফ্যাসিবিরোধী রচনাসংকলন), মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৪৭১
৮৪। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ১৪-১৫
৮৫। The Modern Review, Vol. LXII, No. 4, Whole No. 370, October, 1937
৮৬। চিন্মোহন সেহানবীশঃ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১৭
৮৭। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থ খন্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ২০৮-০৯
৮৮। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আনন্দবাজার পত্রিকার কাটিং থেকে গৃহীত, তারিখঃ২৪অক্টোবর, ১৯৩৭।
প্রসঙ্গত স্মর্তব্য 'কবিবার' শব্দটি তদনুরূপ রাখা হয়েছে।
৮৯। 'প্রলয়ের মুক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৪৩১-৩৩
৯০। অবন্তীকুমার সান্যাল, অনুদিতঃ ভারতবর্ষঃ দিনপঞ্জী(রোমাঁ রোলাঁর 'ইন্দে'), র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ৫১৪
৯১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৫৪৬
৯২। নরহরি কবিরাজঃ রবীন্দ্রনাথঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ৩৬৫
৯৩। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থ খন্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ২৯৩
৯৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ২১৪-১৫
৯৫। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ২৬-২৭
৯৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃঃ১৫১
উল্লেখ্য যে, পত্রটি 'ইউনাইটেড প্রেসের' মাধ্যমে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্যঃ
The Modern Review, Vol. LXIV, No. 1, Whole No. 379, July, 1938, p. 11-12

৯৭। অনূদিত উদ্ধৃতাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য গোপাল হালদার সম্পাদিত 'বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য', মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ২৯
মূল চিঠির জন্যে দ্রষ্টব্যঃ The Modern Review, Vol. LXIV, No. 4, Whole No. 382, October, 1938, p. 486-87
৯৮। অনূদিত উদ্ধৃতাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ৩১, মূল চিঠির জন্যে দ্রষ্টব্য 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রাগুক্ত সংখ্যা, পৃঃ৪৮৭-৮৮
৯৯। মূল চিঠির জন্যে দ্রষ্টব্যঃ The Modern Review, Vol. LXIV, No. 5, Whole No. 383, November, 1938, p. 636
১০০। অনূদিত উদ্ধৃতাংশের জন্যে দ্রষ্টব্য নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', পঞ্চম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ৪৪-৫৯।
১০১। চিন্মোহন সেহানবীশঃ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, নাভানা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১০২
১০২। গোপাল হালদার, সম্পাদিতঃ বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ৩৭-৩৮
১০৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৬৮০
১০৪। নেপাল মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ১৬১-৬৫
১০৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ২৭২-৭৩
১০৬। তদেব, পৃঃ২৮১
১০৭। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ৪২৮
১০৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬০বঙ্গাব্দ, পৃঃ২০৩-০৪
১০৯। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ৭
১১০। তদেব, পৃঃ ৯-১০
১১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ৩৩৩-৩১
১১২। তদেব, পৃঃ৩৩৫
১১৩। তদেব, পৃঃ৩১৯
১১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৫৩১
১১৫। নেপালচন্দ্র মজুমদারঃ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ১৪৫-৪৬
১১৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৮৫৮
১১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ৩২৭
১১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৮২২

১১৯। বিনয় ঘোষঃ নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ৬৭
১২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৭১৫
১২১। তদেব, পৃঃ৮৪৬
১২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ৩০১-৩৩
১২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৪০৪-০৫
১২৪। তদেব, পৃঃ৪০৬-১১
১২৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩বঙ্গাব্দ, পৃঃ২৮৩
১২৬। 'ভবৎকবিতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ৮৯৮